আমরা অনেক সময় বিদেশীয় রমণীগণকেই আদর্শ-স্থানে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যে-দেশে বিদুষী, খনা, গার্গী, লীলাবতী, বীরত্বে দুর্গাবতী, কর্ম্মদেবী, সতীত্ব-রক্ষার্থে ভীমসিংহ-বনিতা পদ্মিনী, ভগবদ্‌ভক্তিতে মীরাবাই, পাতিব্রতে সীতাদেবী, ন্যায়-পরায়ণতায় কৌরব-জননী গান্ধারী, পরোপ-কারে কুন্তীদেবী প্রভৃতি কতশত পুণ্যবতী সতী সাধ্বীর ইতিহাস আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই দেশেরই ত কন্যা আমরা! আমাদের স্বদেশে আদর্শের অভাব কি?

দয়াময়ি জগজ্জননি! আজ আমরা তোমারই আশীর্ব্বাদে এখানে সমবেত হইয়াছি। হে উৎসবের দেবতা! তোমারই অপার করুণায়, আজ এ উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, দয়াময়ি মা! তুমি আমাদের যে কার্য্য করিবার জন্য এ জগতে পাঠাইয়াছ, তোমার প্রতি চিরদিন ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া আমরা যেন সুচারুরূপে সে-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীপ্রভাতনলিনী দাসগুপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বস্ত্রসমস্যা ও বস্ত্রের আইন।—ভারতের কলে প্রস্তুত কার্পাস-বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বস্ত্রের আয়তন হ্রাস করিয়া এবং সূক্ষ্ম-সূত্রের পরিবর্ত্তে মোটা সূত্র ব্যবহার ও তিনটানা বুননের পরিবর্ত্তে পালো-বুননের আদেশ দিয়া ঐ সকল বস্ত্রের অল্প মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এদেশের বস্ত্র-কলের সত্ত্বাধিকারিগণ লাভ কমিয়া যাইবে, এই ভয়ে নূতন আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই নগরে সম্প্রতি বিলাতী ও জাপানী, সকল প্রকার বস্ত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এখানেও যাহাতে এইরূপ মূল্য-হ্রাস হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য-দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা।—এতদিন বস্ত্রের মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-দ্রব্য মহার্ঘ হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এ সুবিধাও অন্তর্হিত হইয়াছে। চাউল, ময়দা, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যেরই মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করা এক মহাসংগ্রামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, ভারতবাসীর প্রাণ কয় দিন বাঁচিবে, ইহা চিন্তার বিষয়।

বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাল্ডসে ও বঙ্গের স্বাস্থ্য।—সংপ্রতি লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় জানাইয়াছেন যে, "হুকওয়ারম্"-নামক কীট বঙ্গদেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। শতকরা ৭১ জন লোক "হুকওয়ারম-কীটদ্বারা আক্রান্ত হইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। এই ব্যাধি হইতে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাহারা খালি পায়ে থাকে, তাহা-

দিগেরই না কি এই রোগ অধিক হয়। থাইমল এই ব্যাধির প্রধান ঔষধ। বঙ্গেশ্বর আমাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

সম্রাটের আনন্দ।—বিগত দুই তিন মাসে সেনাবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য অধিকসংখ্যক ভারতবাসী অগ্রসর হইয়াছে, দেখিয়া সম্রাট্ মহোদয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বড়লাট-বাহাদুরকে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সম্রাটের সন্তোষে সকলেই সুখী।

যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন।—জেনারেল ষ্ট্রেঞ্জ এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও হাবড়ায় যুদ্ধের উপযুক্ত যাহার যত ঘোড়া আছে, তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।—লোকে যাহাতে সুলভে চাউল, গম প্রভৃতি পাইতে পারে, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি তাহার জন্য নূতন নূতন দোকান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এখানেও এইরূপ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতে শাসন-সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান।—ভারত-শাসন-সংস্কারের সংক্রান্ত নির্ব্বাচন-প্রথা ও নির্ব্বাচকদিগের নিয়মাবলী-বিষয়ে বিবেচনার জন্য যে কমিটি হইবে, তাহাতে লর্ড সাউথবরো চেয়ারম্যান হইবেন, স্থির হইয়াছে। আগামী শীতকালে কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।—এ বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভারতীয় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন;—সি, ডি, দেশমুখ; এস, কে, সিংহ; কে, সি, চন্দর; এস, জি, সেনোদাইয়র; এবং এস, লালা। ইহারা প্রথম হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর, এন, ব্যানার্জ্জি ও ভি, এন, বৈদ্য গুণানুসারে পরবর্ত্তি-স্থান দখল করিয়াছেন।

বিজয়া।

ভূপকল্যাণ (ভূপালী)—একতালা।

শারদ আননে, বঙ্গভবনে, শারদ ষষ্ঠী সান্ধ্য বাসরে,
বাজিয়া উঠিল বোধন-বাজনা, যে-দিন তোমার আহ্বান তরে!
এস মা, দুর্গে, দুর্গতি-নাশিনী, উঠিল ধ্বনি হৃদয় ভেদিয়া,
ভাসিল বঙ্গ পুলক-লহরে, তোমার অভয় চরণ লভিয়া।
দুঃখ, তাপ, জ্বালা, হৃদয় হইতে মুছাতে করুণ করে,
এসেছিলে তুমি, আশিস্ কুসুম ঢালিতে সন্তান-শিরে।
বর্ষ-পরে যদি এলে মা, জননি অধম সন্তান-ভবনে,
স্বল্প দিন-এর, অন্তে পুনঃ আজ, চলিলে কেন গো সঘনে!

এলে যদি মা গো, হেরিতে সন্তানে একটী বরষ পরে,
যাবে কেন তাতে, সন্তান-বেদন না ঘুচালে কৃপা করে।
যাবে যদি তুমি, একান্ত জননি, আনন্দ-মঙ্গল-দাত্রি!
ব্যথিত এ ভক্তে রেখো কৃপাদৃষ্টি, কৃপাময়ি জগদ্ধাত্রি!
দিয়ে যাও তব সন্তানে শিখায়ে, মধুর মঙ্গল মন্ত্র,
যেন তারা সবে, প্রাণে প্রাণে মিলি, গায় প্রীতি-প্রেম-ছন্দ!
শান্তি সুখাবেশে, বরষে বরষে, একান্ত ভকতি ভরে,
সন্তান তোমার, পূজিতে তোমায় আহ্বানি আনিতে পারে।

কথা—"ব্রহ্মবাদী" হইতে উদ্ধৃত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২ ৩ ০ ১

II গা রা রা । সা ধা সা । রা গা রা । গা গা গা I
(১) শা র দ আ ন নে ব ঙ্ গ ভ ব নে
(৫) দু : খ তা ০ প জ্ঞা ০ না স্ত দ য়
(৯) এ লে ০ য দি ০ মা গো ০ হে রি তে
(১৩) দি য়ে যা ও ত ব স ন্তা নে শি খা য়ে

২ ৩ ০ ১

I সা রা গা । পা ধা র্সা । র্সা র্রা র্রা । র্সা -া র্সা I
(১) শা র দ ষ ষ্ঠী সা ন্ধ্য বা ন ০ রে
(৫) হ ই তে মু ছা তে ক রু ণ ক ০ রে
(৯) স ন্তা নে এ ক টি ব র ষ প ০ রে
(১৩) ম ধু র ০ ম ঙ্ গ ল ০ ম ০ ন্ত্র

২ ৩ ০ ১

I পা গা পা । ধা র্সা র্সা । র্রা র্গা র্রা । র্রা র্সা র্সা I
(২) বা জি য়া উ ঠি ল বো ধ ন মা জ না
(৬) এ সে ছি লে তু মি আ শি স্ কু সু ম
(১০) যা বে কে ন ন্তা তে স ন্তা ন বে দ ন
(১৪) বে ন ন্তা রা স বে প্রা ণে প্রা ণে মি লি

২ ৩ ০ ১

I পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । গা পা গা । রা -া সা I
(২) বে দি ন তো মা র আ হ্বা ন ত ০ রে
(৬) ঢা লি ছে স ন্ তা ০ ০ ন শি ০ রে
(১০) না ০ মু চা ০ লে ০ কৃ পা ক ০ রে
(১৪) গা ০ য় প্রী ০ তি ০ প্রে ম ছ ০ ন্দ

২　　৩　　০　　১

I { পা গা গা । পা ধা পা । র্সা র্সা র্রা । র্সা র্সা র্সা I
(৩) এ স মা　ছ র্ গে　ছ র্গ তি　না শি নি
(৭) ব ষ প　রে ষ দি　এ লে মা　জ ন নি
(১১) যা বে ষ　দি তু মি　এ কা ন্ত　জ ন নি
(১৫) শা ন্তি স্থ　খা বে শে　ব র যে　ব র বে

২　　৩　　০　　১

I র্সা র্রা র্গা । র্গা র্গা র্পা । র্গা র্রা র্গা । র্রা -া র্সা I
(৩) উ ঠি ল　ধ্ব নি হ্ল　দ য় ভে　দি ০ য়া
(৭) অ ধ ম　০ স ন্　তা ন ভ　ব ০ নে
(১১) আ ন ন্　দ ০ ম　ঙ্ গ ল　দা ০ ত্রী
(১৫) এ কা ন্　ত ০ ভ　ক তি ০　ভ ০ রে

২　　৩　　০　　১

I র্গা র্গা র্গা । র্পা র্পা র্পা । র্রা র্গা র্রা । র্সা র্সা র্সা I
(৪) ভা ০ সি　ল ব ঙ্গ　পু ল ক　ল হ রে
(৮) স্ব ল্প দি　ন্ এ র　অ ন্তে পু　নঃ আ জ
(১২) ব্য থি ত　এ ভ ক্তে　রে খো ক্ত　পা দ্ দৃ ষ্টি
(১৬) স ন্তা ন　তো মা র　পূ জি তে　তো মা র

২　　৩　　০　　১

I পা ধা পা । পধা র্সা র্সা । পা ধা পা । গা রা সা } II
(৪) তো মা র　০অ ভ য়　চ র ণ　ল ভি য়া
(৮) চ লি লে　০কে ন ০　গো ০ ০　স ঘ নে
(১২) কৃ পা ক　০য়ী ০ ০　জ গ দ্　ধা ০ ত্রী
(১৬) আ হ্ বা　০নি ০ ০　আ নি তে　পা ০ রে

বিধাতার ভুল।

(গল্প)

ক্রমাগত তিনদিন ষ্টেসনে হাঁটাহাঁটি করার পর অতিকষ্টে একখানি 'সেকেণ্ডক্লাস' কামরা রিজার্ভ পাইলাম। ইচ্ছা তীর্থযাত্রা। কিন্তু সঙ্গের সাথী মজ্জাগত বিলাসিতা। রিজার্ভ কাম্‌রা ছাড়া যাতায়াত অভ্যাসও নাই; ইচ্ছাও নাই। বিশেষতঃ এ সময়;—এ সময় সে ক্ষমতাও নাই। সরকার যখন আসিয়া শেষ নোটিশ দিল; কহিল, "বাবু, আমাদ্বারা হোল না। আপনি নিজে যদি পারেন, চেষ্টা করে দেখুন; আমার কথা কোনই গ্রাহ্য

করে না।" এবং মনের কষ্টে সে যখন সমস্ত রেলকর্ম্মচারীকে শ্বশুরবাড়ীর অতিপ্রিয় মধুর সম্বোধনে অভিহিত করিল, তখন অগত্যা মনিব-মহাশয়কে সশরীরে স্বয়ং টম্‌টম্ হাঁকাইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইতে হইল। তারপর তুচ্ছতর টিকিট বিক্রয়ের ঘর হইতে শ্রেষ্ঠতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে করিতে শঙ্কিতনেত্রে যাত্রিদলের দিকে চাহিয়া—শুধু চাহিয়াই, যেন প্রাণটা ওষ্ঠাগত বলিয়া মনে হইল। এর নাম কি ভিড়?

পাঞ্জাব মেলের সেই দুর্লভ কাম্‌রাটীতে অধিষ্ঠিত হইয়া, মনে হইল, এখন আমরা সকল দুর্ভাবনার বাহিরে আসিয়াছি। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে তখন সেই জন-সংঘের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কি কৃপার পাত্র বেচারারা! এতটুকু জায়গার জন্য মারামারি কাটাকাটি পড়িয়া গিয়াছে; কোথাও বা সকরুণ প্রার্থনা! সে প্রার্থনা শুনিয়া মনে হয়, দ্বার খুলিয়া তাহাদের আমার অধিকৃত এই স্বল্পায়তন রাজ্যটীতে লইয়া আসি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায়, এই ক্ষুদ্র কাম্‌রাটী আমাদের তিনজনের কাছে প্রচুর-আরামপ্রদ হইলেও এতগুলি লোকের অসুবিধা দূর করিতে একেবারেই সমর্থ হইবে না। আর সেই আরামও আমার কাছেই সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত দুষ্প্রাপ্য ছিল! প্রাণের ভিতরটাতে দুঃখের সঙ্গেও বেশ একটা আনন্দ আসিতেছিল, আর সে আনন্দটা যে আদিম বর্ব্বরতার চিহ্ন স্বার্থপরতারই আনন্দ, তাহাও আমার নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল না!

মেল ছাড়িল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর আর একটু, তারপর আরও একটু গতি বৃদ্ধি করিয়া, শেষে পুরাদমেই ট্রেন চলিতে লাগিল। আমি যাত্রার সুখটুকু চরম উপভোগ করিবার জন্য গরম 'র‍্যাগ্'খানা পায়ের উপর টানিয়া বেঞ্চিতে লম্বা হইলাম। অনিলের হাতের সিগার তখনও 'মনোদুঃখে ভস্মাবশেষে' পরিণত হয় নাই। সে আমাকে শাসাইয়া বলিল, "মজা করে শুয়ে থাক্‌লেই হবে না। তোর বউ যা খাবার দিয়েছিল, তার হাঁড়িটা তো ষ্টেসনে ফেলে এসেছি, দেখ্‌তে পাচ্চি! বর্দ্ধমানে কিছু খাবার কিনে না নিলে, ট্রেণের মধ্যে একাদশী। আমি বলিলাম, "হাঁড়িটাও আসে নি, খাবারটাও না? তোর কাছেই সেটা বিশেষ করে জিম্মা করে দিয়েছিলুম না?" অনিল রাগিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া, চোখ বুজিলাম।

রাত্রি নিস্তব্ধ। কানন, প্রান্তর শঙ্কিত করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল। ক্রমে সে শব্দও কানে সহিয়া আসিল। শুধু ঘুম-পাড়ানো দোলার মত একটা অতিধীর দোল লাগিতেছিল। আমি বড় আরামেই পড়িয়া রহিলাম।

সহসা আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সাধের দোল কখন্ থামিয়া গিয়াছে! গাড়ী একটা জন-কোলাহল-মুখরিত ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের এত কষ্টের ফল—'রিজার্ভ'-কামরাটুকুও বিনা বিচারে অধিকার করিবার নিমিত্ত একদল কাবুলী দ্বারের সম্মুখে সার দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের পাদানে পা দিয়া প্রকাণ্ড বোচ্‌কা ও মস্ত পাগ্‌ড়ী-সমেত এক কাবুলী দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে। আমিও বিদ্যুদ্‌বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্ধুবর অনিলচন্দ্র ঝুলানো বেঞ্চে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মিহিদানার রূপ তিনি, বোধ হয়, স্বপ্নেই দেখিতেছেন! নীচের বেঞ্চে সুধীর নিতান্ত সুধীরের মতই শয়ান! শালের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার বামচরণ-খানি ট্রেনের তক্তায় লুটাইতেছে। আমার হাসি আসিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার বিশেষ সময় ছিল না। 'সফ্‌রা-জেটে'র মত কাবুলীদের অধিকার নাকচ্‌ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইল। আমার বাক্যাবলীতে বিশেষ কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। আমার অবস্থা প্রায় 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়'। এমন সময় একটা কুলী খুব জোরে হাঁকিয়া গেল—"আসেন্‌ সোল—আসেন্‌ সোল।"

এটা তবে আসেনসোল। সময়ও তা হ'লে যথেষ্ট আছে। আমি 'গার্ডে'র উদ্দেশে নামিয়া পড়িলাম। বঙ্গদেশের একজন প্রখ্যাতনামা জমিদারের অনুনয়-বিনয়, আদেশ-তিরস্কারে যে কাবুলীর দল এক পা নড়ে নাই, সোলা-হাট্‌-শোভিত শুভ্রমুখের একটীমাত্র তীব্র-দৃষ্টিতে তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে কে কোথায় সরিয়া পড়িল, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিরিতে ফিরিতে আপনার মনেই বলিলাম যে, "তাই তো বর্দ্ধমান ফেলে এসেছি! মিহিদানা কেনা হোল না!" এই সময় একজন বলিল, "দুঃখ কর্‌চেন কেন ম'শায়! এখানে বর্দ্ধমানের চেয়ে ভাল মিহিদানা পাওয়া যায়। এই খাবার-ওয়ালা।" এ অযাচিত অনুগ্রহ-বর্ষকটীতে দেখিবার জন্য আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারিটী চক্ষুই বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "শ্রীপতি! তুমি কোথা থেকে? যাচ্চ কোথা? সঙ্গে কে? ইত্যাদি।" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া, সেই প্রশ্নধারার উপর প্রশ্নধারা বর্ষণ করিয়া বলিলাম, "তুমিও যে আশ্চর্য্য করে দিলে! মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌লে নাকি হে?—আমি যাচ্চি এলাহাবাদ কুম্ভমেলা। তুমি কোথায় যাচ্চ?" দেবেন বলিল, "বেনারস্‌! কন্‌ফারেন্সে ডেলিগেট হয়েছি।—দেবেনকে সে বাকি কথা সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ না দিয়াই আমি তাহার হস্ত টানিয়া বগলে পুরিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া, চিৎকার করিয়া অনিলকে ডাকিলাম; বলিলাম, "বর্দ্ধমান ছাড়ে যে, শীগ্‌গির মিহিদানা কিনে নাও?" বেচারা অনিল, ও সুধীর আমার উচ্চকণ্ঠরবের দায়ে অগত্যা ধড়মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহাদের সদ্যোনিদ্রোত্থিত বিস্ময়-বিহ্বল ভাব দেখিয়া আমি আর বাক্যব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া দুইটা টাকা ফেলিয়া দিলাম। মিহিদানার চাঙাড়ী গাড়ীতে উঠিল। ট্রেণও আবার গন্তব্যপথে চলিল।

সুধীর শালটা টানিয়া লইয়া, দেবেনকে নমস্কার করিল ও সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "দেবেন্‌-দা কোথা থেকে?" দেবেন তাহার সুপুষ্ট কোমল গৌর মুখখানি একটু নাড়িয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ নাবালকটাকে আবার কোথা থেকে যোগাড় করেচ? এ-ও কি কুম্ভমেলায় সঙ্গী না কি?"

বুদ্ধিমান্‌ অনিলচন্দ্রের প্রেমটা তাঁহার জুতা-জোড়ার উপরই বেশী ছিল। চুরি যাই-

বার ভয়ে তিনি সদুপাকই নিদ্রা গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পদনিম্নে দণ্ডায়মান তিনটী ভদ্রলোকের উপর দিয়া সবুট অবরোহণটা কিরূপ হইবে, স্থির করিতেই, তাহার কিছু সময় কাটিয়া গেল। শেষে সাগরলঙ্ঘনকারীর ন্যায় উল্লম্ফনই তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিল। দেবেন হাসিয়া বলিল, "ব্রেভো অনিল।"

খানিকটা হাস্যোপহাস ও গোলমালের পর, আমাদের প্ল্যান্ ঘুরিয়া গেল। কুম্ভমেলার স্থান বেনারস্ কন্‌ফারেন্সই অধিকার করিল। সব স্থির হইলে, দেবেন্ বলিল, "আচ্ছা আমি তো সঙ্গেই রইলুম্; তা হোলে এখনকার মত এস, সব ঘুমোনো যাক্।"

অনিল এবার সবচেয়ে জোরে মাথা নাড়িল ও বলিল, "এখনো ঘুম? তোমাকে পেয়ে আবার ঘুম আসে?"

দেবেন সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুই ঘুমোবি নে? সুধীর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কল্‌কাতা থেকে আরম্ভ করে আসেন্‌সোল পর্য্যন্ত হয়েছে; আরো ঘুম হয়, দেবেন-দা?"

আমি অবশেষে। একমাত্র আমারই মূল্যবান্ অভিমত অবশিষ্ট দেখিয়া দেবেনকে তৃতীয় দফা কষ্ট স্বীকার না করাইয়া, বলিয়া উঠিলাম, "আমি সকলের আগেই ঘুমিয়েছি; আর আমাদেরি দল পুরু; সুতরাং, তুমিও অদ্য নিদ্রাকে আমল দিতে পাচ্চ না।"

অনিল আবার আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "রাস্তায় ঘাটে বেরোতে হ'লে যে একজোড়া তাস সঙ্গে করে বেরোতে হয়, সে জ্ঞান যে তোমার কবে হবে, তা বুঝ্‌তে পারি না! এদিকে হার ম্যাজেষ্টির এত সুখ্যাতি হয়, বউ বুঝি এমনিই গোছাল!"

দেবেন বলিল, "সে বেচারার ওপর আর রেলের মাঝে এত আক্রোশ করে কি হবে? দোষটা যে তাঁর, তা তো সকলেই বুঝ্‌তে পারচি।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "বৌ-দি যে খাবারের হাঁড়ি দিয়েছিলেন, অনিল-দা সেটাকে রাস্তায় ফেলে এসেছেন্; আর তবু বৌদিরই যত দোষ!"

অনিলের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলাম। হাসি থামাইয়া আমি দেবেনকে বলিলাম, "আজকের রাতটা কাটানোর ভার তুমিই নাও। খুব ভাল দেখে একটা গল্প আমাদের বল। তোমার তো ভাঁড়ার অফুরন্ত।"

দেবেন হাসিয়া বলিল, "অফুরন্ত হ'তে পারে; তা বলে ভালর গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি না।"

সুধীর দেবেনের বাঁ দিকটা ঘেঁসিয়া বলিল, "হাঁ দেবেন্-দা, বল্‌তে হবে! অনেক দিন তোমার গল্প শুনি নি।"

মাঝের বেঞ্চ মাঝেই রাখিয়া অনিল একেবারে ওধারের বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছিল; শিষ্টতা-বহির্ভূত হইলেও তাহার পাদুকাসহ চরণ-দুইখানি মধ্যের বেঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। আমি দেবেনকে আবার অনুরোধ করিলাম। দেবেন পিছনের কাঁচখানা খুলিয়া ফেলিল। শীতের কন্‌কনে বাতাস খানিকটা আসিয়া আমাদের মুখে চোখে ঝাপ্‌টা মারিল। রাত্রি অনুজ্জ্বল; তারাও নাই, জ্যোৎস্নাও নাই; যেন ছায়ামাখা; পাতলা মেঘের

চামর-ঢাকা। গাছগুলা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবেন বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমাদের দেশে একটী খ্রীষ্টান উকীল ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে, সংস্কারের সকল চেষ্টার মূলে সকলের আগে তাঁহাকেই দেখা যাইত। যদিও নিজে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, তবু অপর-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর তাঁহার কখনো কোন বিদ্বেষ দেখা যায় নাই। বরং যেখানে যে কেহ কোনও বিপদে পড়িত, যাহার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা হইত, তিনি বুক দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেন, প্রাণ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন।

"সুবালা তাঁ'রই মেয়ে। পিতার উপযুক্ত কন্যা। শুধু গুণবতী নয়; অসামান্যা সুন্দরী। পিতা অতিযত্নে কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মেয়েটীকে তিনি বড় বেশী ভাল বাসিতেন। সুবালার দুইটী ভাই আছে। তাহারা বড় তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সুবালা সে-রকম ছিল না। লেখাপড়ায় তাহার আসক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এণ্ট্রান্স হইতেই সে বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করে।

"ছোট বেলায় সে আমার সঙ্গে পড়িত। আমরা একক্লাসেই পড়িতাম। একসঙ্গে পড়া না করিলে, আমার পড়া ভাল হইত না। সুবালার মা-ও আমাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম, পড়িতাম, খেলিতাম; বাগানে আমগাছে বাঁধা দোলায় বসিয়া দুইজনে দুলিতাম। এখনো সে দিনগুলি ছবির মত মনে পড়ে।

"নদীর ধারেই সুবালাদের বাড়ী ছিল। সুবালার পিতার একখানি জালি-বোট ঘাটে বাঁধা থাকিত। কতদিন সন্ধ্যার সময়, কখন বা জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আমরা সেই জালিবোটে করিয়া বেড়াইতাম্। ছোট নদীটির কালো বুক কাঁপিয়া উঠিত। স্রোতের সঙ্গে তর্‌তর্ করিয়া 'বোট্' ছুটিত। সুবালা আমার তরি-চালনের প্রশংসা করিত। আর আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নামাখা শুভ্র-মুখ-বিনির্গত প্রশংসা-বাক্যে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতাম। সুন্দর মুখের চেয়ে, তখন প্রশংসা-বাক্যেরই কদর বেশী ছিল।

"সুবালা আমার চেয়ে বেশী ছোট ছিল না। দু'বছর কি তিন বছর আমাদের বয়সের ব্যবধান ছিল। দুইজনে সমবয়সীর মতই মিশিতাম্। আমি তো তখন বালক বলিলেই হয়; বড় জোর ১৬।১৭ আমার বয়স। আর সুবালা বোধ হয় ১৪ বছরের। কিশোর-লাবণ্য তাহার সুষমা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল; কিন্তু সে-দিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা আমার একেবারেই হয় নাই। পিতামাতার শিক্ষার গুণে চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কিশোরীও দশবছরের বালিকার ন্যায় সরলা ছিল। পাঠে আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, সেজন্য কলহও সময়ে সময়ে বড় অল্প হইত না। আবার বন্ধুত্বও তেমনই ছিল। কত রকমারি গল্প দুজনের মধ্যে হইত। বড় হইয়া চন্দ্রলোকের একটা পথ আবিষ্কার, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কল্পনা ছিল। তা ছাড়া পুকুরে কেন পদ্ম ফোটে ও নদীতে কেন ফোটে না? এই তত্ত্বের গবেষণাতেও অনেক সময় কাটিয়া

যাইত। সময় সময় সমুণাল পদ্ম-কোরক তুলিয়া, বেশী করিয়া মাটির চাপ্‌ড়া নালে বাঁধিয়া, নদীতে রাখিয়া আসিতাম। বিশ্বাস ছিল, এবার আমাদের স্থাপিত পদ্ম নিশ্চয়ই নদীতে ফুটিয়া উঠিবে। পরদিন কিন্তু চারিটি উৎসুক নেত্র বিষাদে ম্লান হইয়া পড়িত। নিরাশা-মলিন সুবালার চোখের কাল পাতা জলে ভিজিয়া উঠিত। আমি অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, নিজের দুঃখ ভুলিয়া, তাহাকে ভুলাইবার জন্য, দিদিমার নিকট শ্রুত একটা অসম্ভব রকম রাজার গল্প নিজের মনে জোড়াতাড়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিতাম। শুনিতে শুনিতে সে আপনার নিষ্ফল দুঃখ কখন্ ভুলিয়া যাইত! অধর-প্রান্তে তাহার অজ্ঞাতসারেই মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিত। আর সেই সময় আমি সহসা বলিয়া উঠিতাম, "কই, কোথায় তোমার চোখের জল?" সুবালা তখন স্পষ্ট হাসিয়া উঠিত।

"একদিন দুইজনে বোট হইতে নামিয়া বাড়ী ফিরিতেছি; উদ্যানে দেখিলাম, আঠার-উনিশ বছরের একটী যুবক নতনেত্রে নম্রভাবে সুবালার পিতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুবালার পিতা হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি সে-ভার নোব, তোমার কোন চিন্তা নেই, বিনয়! বিলেতে আমি তোমাকে যেমন করেই হোক্ পাঠাব। আজ থেকে তুমি আমার সন্তানস্থানীয় হ'লে। তোমার বই-টই নিয়ে এসে, আজ থেকে আমার এখানে থাক; বি, এ-টা দেবার জন্যে প্রস্তুত হও। পরের বাসায় থেকে আর কাজ নেই।" সুবালার পিতার করুণ হৃদয়ের কথা আমাদের দেশে কাহারই অজ্ঞাত ছিল না। আমরা পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর জানো তো, আমি সিটিকলেজে ভর্ত্তি হই। দুই বৎসর দেশে যাই নাই; দুই বৎসর সুবালাকেও দেখি নাই। দুই বৎসর পরে যখন যাইলাম, তখন আমার প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স-বৃত্তি এফ-এ পাশের উত্তাপে মনের ভিতরটাও বেশ উত্তপ্ত ছিল। কলিকাতার উচ্চ সভ্যতা তখন আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে, লক্ষ্যও বড় উচ্চ।

"সেই গর্ব্বস্ফীত হৃদয় লইয়া সুবালাদের বাড়ী যাইলাম। সুবালার পিতামাতা আমাকে সস্নেহে কাছে বসাইলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু সুবালাকে দেখিলাম না; মনে করিলাম, হয় তো তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন ইচ্ছা হইল না। উঠিয়া আসিবার সময় বারান্দা হইতে দেখিলাম, সুবালা বোট হইতে নামিতেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তাহার যৌবন-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মুখ হইতে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে, বোধ হইল। এই দুই বৎসরে সুবালার এ-রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আমি বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিলাম।

"সুবালা কি বলিল, বুঝিলাম না; কিন্তু নিজের যেন চমক ভাঙ্গিয়া আত্মস্থ হইলাম। দেখিলাম, সেই আশ্রয় প্রার্থী যুবক বিনয় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সুবালা তাহাকেই কি বলিতেছে। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, সুবালাও আমার সহিত এফ-এ পাশ করিয়াছিল।

"আমার ছাত্রজীবনের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর ভিতর চোখে পড়িবার বা মনে রাখিবার মত একটাও ঘটনা ঘটে নাই। সুবালার কথাও ভুলিতেই চেষ্টা করিতাম। জানি না, কেন মাঝে মাঝে সেই শান্ত মুখ, খর্ব্ব কৃশকায় বিনয়ের উপর মনে মনে একটা আক্রোশ উপস্থিত হইত।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদেবীর করুণা-কটাক্ষ লাভ করা বড় সহজে হয় না। মানব-জীবনের অনেকখানি সার্থকতা তাঁহার চরণতলে দান করিয়া, তবে তাঁহার চিহ্নিত একটা মানুষ (?) হওয়া যায়। আমিও একটা চিহ্নলাভের জন্য ব্যস্ত ছিলাম। অন্য সকলই সেই সাধনায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

"কলিকাতায় আসিবার মাস কত পরে, ক'মাস ঠিক মনে নাই, একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে, বিলাত-যাত্রিজাহাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখনই জাহাজ ছাড়িবে, কোলাহলে জেটী ও ষ্টীমার মুখরিত। আমি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে সেই কোলাহল-পূর্ণ জাহাজখানা দেখিতেছিলাম। এমন সময় একখানা গাড়ী অভিদ্রুতবেগে জেটিতে আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে নামিলেন, সুবালার পিতা মিষ্টার দত্ত ও কন্যা সুবালা। আমি সম্মুখেই ছিলাম। তাঁহারা বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেন্ নাই, কিংবা চিনিতে পারেন্ নাই। উভয়ে দ্রুতপদে জাহাজে উঠিলেন। আমি কারণ না বুঝিয়া চাহিয়া রহিলাম। অল্প পরেই তাঁহারা নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টীমারও দূরে সরিতে লাগিল। এবার আমি সুবালার মুখ পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। তাহার চোখে জল। আমি এবার চেষ্টা করিয়া একটা পাটের স্তূপের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম্। দেখিলাম, জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, সেই বিনয়। কৃশকায়ের উপর সাহেবী পরিচ্ছদ। হাতে একখানি সাদা রুমাল। তখন কারণ বুঝিলাম। বিনয়কে বিদায় দিতেই সুবালা ও মিষ্টার দত্ত আসিয়াছিলেন। আরও বুঝিলাম ভাবী বিরহের আশঙ্কাতেই সুবালার চোখে জল।

"যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, সুবালা একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জাহাজ অদৃশ্য হইলে সেও গাড়ীতে উঠিল। অঙ্গহীন দেবতাটীর প্রতাপের কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে আমিও মেসে ফিরিলাম। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, বিনয় সিভিল সার্ব্বিশ পাশ করিয়া আসুক্, সুবালা তাহার সহিত মিলনে সুখী হউক্। আশীর্ব্বাদটা, বোধ হয়, মনের সঙ্গে করি নাই।"

দেবেনের কথায় বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" দেবেন আমার মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়া হাসিল। এই অবসরে রুদ্ধশ্বাস মুক্ত করিয়া আমি একবার অনিলের দিকে চাহিলাম। গাড়ীর শার্সিতে ঠকাঠক্ মাথা ঠুকিতেছে, তবু ভায়া বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা আরম্ভ করিয়াছেন্। দেবেনের কোলে মাথা রাখিয়া সুধীরও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগরিত শুধু আমরা দুইটী প্রাণী। রজনীর নিস্তব্ধতা আরো যেন বেশী বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। দেবেন আবার বলিল, "কেন?—আশীর্ব্বাদটা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া। তবে সর্ব্বাংশে নিষ্ফল হয় নাই। বিনয় সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে

ফিরিয়াছিল বটে ; কিন্তু সুবালাদের গৃহে নয়। আমার প্রাইভেট্ টিউশনির ছাত্র ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র অরুণের ভগ্নীর বিবাহে আমি আহূত হইয়াছিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, পাত্রটী সেই বিনয়। অরুণ ছেলেটী বড় সুন্দর; কিন্তু তাহার ভগিনী মিস্ উষাঙ্গিনীকে দেখিলে কাহারও মনে যে প্রেমোদয় হয়, একথা এক-গলা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু উষাঙ্গিনীর পিতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সুবালা হইল সামান্য উকীলের কন্যা! যদিও সুবালার পিতার নিজের অর্থে ও তাঁহার চেষ্টা-সংগৃহীত অর্থ-দ্বারাই বিনয় আজ সিবিলিয়ান্, কিন্তু বলিতে পারি না, কারণ আমি সিবিলিয়ান নই, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা করাটা বোধ হয় সকলের উপযুক্ত কাজ নয়। তাই বিনয় আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের জামাতা। আর মুগ্ধা সরলা পিতৃহীনা সুবালা অসহনীয় হৃদয়ক্ষত বহিয়া আজও অবিবাহিতা।"

আ। মিস্ দত্তকে আর কখনো দেখেছিলে, দেবেন?

দেবেন বলিল, "দেখেছিলাম। আর একবার তাহাকে দেখিয়াছি। তুমি জান, আমি —বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। গত বৎসর প্রাইজের সময় নূতন ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ মিত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি প্রাইজের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই। সেইদিন প্রথম দেখিলাম। তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। আর ঐ ডিবিসনের স্কুল ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ মিস্ দত্তও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম যে বানরের গলে মুক্তার মালা পড়িতে পায় নাই। মিঃ মিত্র ওরফে বিনয়ের সহিত তাহার পত্নীটী যথার্থই শোভমানা হইয়াছেন। আরো দেখিয়াছিলাম, হৃদয়ানলতাপিতা, অগ্নিশুষ্কা, পবিত্রা সন্ন্যাসিনী সুবালার সেই অনুপম রূপরাশি। তপস্যায় যেন রূপের আলোক শত গুণ বাড়িয়াছে। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে একমাত্র দুঃখ এই যে, এক নরাধমের জন্য তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ হইয়াছে। কিন্তু সে নরাধম এ রত্নের আদর বুঝিল না। রত্ন অনাদরে ধূলায় লুটাইল। বিবরণী-পাঠের সময় সুবালার সেই স্পষ্ট কম্পিত স্বর, লজ্জারুণ মুখ আমি ক্ষুব্ধহৃদয়ে দেখিলাম; মনে মনে বলিলাম। "ভগবন্, একি তোমার বিচার! যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন, প্রভু?"

আমি বলিলাম, "দেবেন, সত্য বল, তুমি মিস্ দত্তকে ভালবাস? তাঁরি জন্যে তুমি আজ ও অবিবাহিত?"

দেবেন সদর্পে কহিল, "কারোই জন্য নয়, শ্রীপতি!—চিরকালের জন্য, মরণের জন্য!"

দেবেন চস্‌মাটা খুলিয়া আবার পরিষ্কার করিয়া লইল। বাহিরে কুলিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "মোকামা" "মোকামা"।

শ্রীলতিকা দেবী।

দয়া।

পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছার নাম দয়া। দয়া ঈশ্বরসৃষ্ট গুণ। কেবল নরদেহ ধারণ করিলেই লোকে মনুষ্যপদ-বাচ্য হয় না, তাহার অন্তর্যধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকা চাই, যাহাতে সে সেই সকল গুণে মনুষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে দয়া একটি প্রধানতম গুণ। শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি হয়তঃ সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত এমন কতকগুলি আভ্যন্তরিক গুণ আছে, যাহারা, চেষ্টা করিলেই অথবা স্বভাবতঃই, নিজ নিজপ্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। দয়া তাহাদের অন্যতম।

পরদুঃখ-নিবারণ যে কেবল অর্থ-দ্বারাই সাধিত হয়, তাহা নহে। শারীরিক সামর্থ্য দ্বারাও তাহা সংসাধিত হয়। অনেক লোক অর্থ-দ্বারা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে শরীর-দ্বারা অনেকেই অনেকের বহুল-পরিমাণে উপকার করিতে পারে।

বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যের সকল গুণ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইবার চেষ্টা করে। বাল্যকালই মনুষ্যের ভবিষ্যজীবন-গঠনের একমাত্র ভিত্তিস্থল। এই সময় যে, যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে সেই প্রকারের লোক হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সময় হইতে বালকবালিকাগণকে মাতাপিতার নানা সদ্‌বিষয়ে শিক্ষাদান করা এবং নিজেদেরও সদ্‌ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অনেকে স্বীয় সন্তানসন্ততিদিগকে সদয় ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির দান-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, এবং ইহা হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

বিধাতা আমাদিগকে কেবল স্ব স্ব সংসারকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা মহতী। তিনি আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ও মনুষ্যোপযোগী যাবতীয় গুণাদি দিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মহৎ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার নির্ব্বাহের ভার মনুষ্যমাত্রের উপরই অর্পিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমরা তাঁহার সেই নিয়ম পালন করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি না; কেবল আত্মপরিজন লইয়াই ব্যস্ত থাকি। ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই পাপভাগী হই এবং নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃথা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া পাপের ভার আরও বর্দ্ধিত করি।

যদি ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রত্যেকের ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা উচিত। ঈশ্বর প্রীতির সকলকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য। নিষ্ঠুর মনুষ্য সকলের ঘৃণার্হ ও সমাজে নগণ্য বলিয়া পরিচিত। দয়ালু মনুষ্য তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য চিরকাল সুফল প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জনগণ সকলেই শোক প্রকাশ করে; এবং দেহান্তে সে পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই দয়ার জন্য বিদ্যাসাগর, 'দয়ার সাগর' বলিয়া আজও কীর্ত্তিত হইতেছেন, আজও তাঁহার সদয় ব্যবহার লোকমুখে কথিত হইতেছে, আজও তিনি যেন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেহান্তে যে তিনি নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সদয় ব্যবহারের জন্যই আজও জগতে বিরাজমানা আছেন, আজও তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। এই স্থলে তাঁহার সদয়-ব্যবহার-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। মহারাণী স্বর্ণময়ী একজন আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ে শিক্ষিতা ছিলেন না। তথাপি তিনি দরিদ্রে দান, বিধবার অশ্রু-মোচন, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসংস্থান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান,

আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান, নির্ধন ছাত্র ও উচ্চমনা গ্রন্থকারদিগকে সাহায্যদান এবং পীড়িত ব্যক্তির সুখ-শান্তি-বিধান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি সমগ্র মানবদিগকে আপনার পরিবার মধ্যে গণ্য করিতেন। তাঁহার দানশীলতা, মহানুভবতা ও বিচক্ষণতা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক ছিল। তিনি তুল্য অথবা নিম্নপদস্থ সকল মহিলাগণকে সহানুভূতি ও যথাসম্ভব তাহাদিগের অভাব দূরীকরণে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণে গঠিত ছিল। এই সকল কারণেই তিনি আদর্শরমণী বলিয়া পরিচিতা।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রমণী হইয়াও এই সদয় ব্যবহারের গুণে এইরূপে অসাধারণ প্রভুত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া প্রচুর যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকটএকজন সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য আনয়ন করেন্। মহারাণী তদ্দর্শনে সৈনিকগুরুকে বলিলেন, "পলায়নের অপরাধ প্রাণদণ্ড!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই?" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "এই দুষ্ট সৈনিক তিনবার পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমার বলিবার আর কিছুই নাই।"

মহারাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, এই সৈনিকের কোনও সদ্‌গুণ আছে কি না?" তখন সেনাপতি উত্তর করিলেন, "অনেকে বলে, তাহার চরিত্র মন্দ নহে।" মহারাণী এই কথা শুনিয়া দণ্ডাজ্ঞাপত্রে "ক্ষমা করা গেল।" এই কয়টি কথা লিখিয়া দিলেন।

অন্য একদিন মহারাণী ভ্রমণে বহির্গত হইলে ফ্রান্সিস্ নামক এক দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। সেই ব্যক্তি তাঁহার দেহরক্ষিগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ধৃত হয় এবং বিচারার্থ প্রেরিত হয়। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু মহারাণী সেই দুর্ব্বৃত্ত যুবকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন। তখন বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দয়াই মানুষকে দেবতা করে।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গের প্রেস-সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন্, রায় মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশিত।

মুদ্রাযন্ত্র কিরূপে জর্ম্মণদিগকে সাহায্য করে।

অধুনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে এই প্রশ্ন জাগরূক থাকা উচিত যে, 'যুদ্ধ-জয়ে আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি।' সহস্র সহস্র ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের বৃটিশ বন্ধুদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্স, মেশপটেমিয়া, ইজিপ্ট প্যালেষ্টাইন ও অন্যান্য প্রদেশে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং ভারতীয় লস্কর ও ভারতের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমজীবিগণ-কর্ত্তৃক প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না; কিন্তু এরূপ ব্যক্তি কেহই নাই, যিনি কোনও না কোন প্রকারে যুদ্ধক্ষেত্রাবতীর্ণ আমাদিগের সৈন্যকলাপ-প্রতিপালনার্থ সাহায্য করিতে না পারেন্। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে সংগৃহীত মানবের দ্বারা গঠিত সৈন্য-সকল ভারতবর্ষকে এরূপ এক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে যে, সে-

শত্রু জয়ী হইলে এতদ্দেশীয় মানবগণকে উৎপীড়িত ও তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। সুতরাং, যে-সকল সৈন্য তাহাদিগের জন্য সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করা প্রত্যেক প্রকৃত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অতিশয় সত্য যে, অধুনা ভারতবর্ষে এরূপ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহারা যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগের সৈন্যগণের চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন এবং বলিতে কি, শত্রুর সহায়তা করিতেছে! তাহারা যে কি ক্ষতি করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা বুঝে না যে, তাহাদিগের কার্য্য, জয়লাভ এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা কিরূপ কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কেবল সৈন্যগণই তাহাদের কার্য্য করিবে, তাহা নহে। যে-সকল সৈন্যদল যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, বারুদ, খাদ্য এবং অন্যান্য বহুতর দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। যে-সকল লোক গৃহে অবস্থান করিবেন, তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিতে হইবে; এবং জাহাজ দ্বারা বহু দূরদেশে সাগরের পরপারে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের নিকট তাহা প্রেরণ করিতে হইবে। যাহারা এই সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুতের এবং যোদ্ধৃগণের নিকট পোত-দ্বারা প্রেরণ করা কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে, তাহারা জর্ম্মণ এবং তাহাদিগের মিত্রদিগকে সাহায্য করিতেছে; যেন বাস্তবিকই, তাহারা তাহাদের শত্রুর জন্যই কার্য্য করিতেছে!

ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কেহই নাই, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের যুধ্যমান সৈনিকদিগের অনিষ্ট করিবে বা তাহারা যে-সকল ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত করিবে। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় যে সকল ব্যক্তি ভূগর্ভে মুদ্রা প্রোথিত করিয়া বা মঞ্জুষা-মধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখিয়া এবং অলঙ্কারার্থ দ্রবীভূত করিয়া মুদ্রা-সঞ্চয় করে, তাহারা সমগ্র মানব-জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেশসমূহের এবং নিজেদের দেশেরও অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। এমন কি, সেই সকল বিবেচনাশূন্য ব্যক্তিগণও, যাহারা রৌপ্যালঙ্কারাদি ক্রয় করে, এই দ্রবীকারণের প্রথাতে উৎসাহ-দান করে। যেহেতু এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুতের রৌপ্য বর্ত্তমান সময়ে অন্য কোন উপায়ে লভনীয় নহে। সম্ভবতঃ এই লোকগণ জানে না যে, ভারতবর্ষে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে, এতদ্দেশের কার্য্য-পরিচালনার্থ আবশ্যক নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুদূর বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় করিতে হইবে এবং বিস্তৃত সাগরের উপর দিয়া সুদীর্ঘ পথ বহন করিয়া তাহা আনিতে হইবে। ভারতবাসিগণ অবিবেচকের ন্যায় যে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৫০ কোটী মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগি-রৌপ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই রৌপ্যের অধিকাংশ ভারতে আগমন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ অচিরাৎ প্রেরিত হইবে।

এই প্রভূত পরিমাণ রৌপ্যের উপস্থাপন ও ক্রয় নানাপ্রকারে ক্ষতিকারক। প্রথমতঃ এই ক্রয়ের অর্থ এই যে—সামান্য ধাতুর পরিবর্ত্তে ভারত তাঁহার বিভব বিদেশে প্রেরণ করিতেছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি এই রৌপ্য-ক্রয়ের অর্থ ঋণদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারত বার্ষিক পাঁচ কোটীর অধিক টাকা সুদ পাইতে পারিত। এই আয় বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর-হ্রাস করা বা উচ্চতর শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য অধিকতর ব্যয় করা সম্ভবপর হইত।

শত্রুদিগের নিকট এবিষয়ে আমরা শিক্ষা-লাভ করিতে পারি। জর্ম্মণী যে এই সুদীর্ঘ-কাল যুদ্ধপরিচালনায় সমর্থ হইয়াছে, তাহার

প্রধান কারণ তাহার একমাত্র মূল মন্ত্র "কিছুই নষ্ট করিওনা।" ভারতে রৌপ্য-সঞ্চয়ে যুদ্ধের একটী প্রধান সামগ্রীর দারুণ অপচয়। স্বর্ণ-সঞ্চয়ের বিষয়েও ঠিক এই একই কথা। গোলা-বারুদাদি সামগ্রী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে ভূগর্ভে প্রোথিত রাখা যেরূপ নিন্দনীয়, ইহাও তদ্রূপ। ইংলণ্ডের প্রধান সচিব আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, রৌপ্য-গুলিকাই যুদ্ধজয় করিবে; কিন্তু তথাপি এই ভারতবর্ষে আমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করিয়া রৌপ্য- ও স্বর্ণ-গুলিকা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি; যাহাতে যুদ্ধজয়ে তাহাদের দ্বারা সাহায্য না হয়।

ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ধাতুর ব্যয়লাঘবার্থ ভারতবর্ষ ভিন্ন সমুদায় দেশেই নোটের প্রচলন বর্দ্ধিত ও লোকপ্রিয় হইয়াছে। জাপানে এই প্রথা বিশেষরূপে চলিয়াছে। বাস্তবিক, সেস্থানে অতিক্ষুদ্র নোট-সকল এখন চলিতেছে। কেবল ভারতবর্ষেই একমাত্র নোটের পরিবর্ত্তে লোকে বহুল পরিমাণে ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে, অন্য দেশের লোক এই উপায়ে প্রভূত লাভ করিতেছে এবং ভারতের ব্যয়ে তাহারা অধিকতর ধনবান্ হইতেছে।

এই ধনসঞ্চয়ের কুফল ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার খনি-সমূহ হইতে রৌপ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের পরিশ্রম আবশ্যক। এইরূপে নিযুক্ত না থাকিলে এই সকল লোক যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিত। আমেরিকার এই রৌপ্য ট্রেণে করিয়া বন্দরে আনিতে হয় এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ইহা এদেশে আসে। যুদ্ধ-সামগ্রীর বহন-কালে এরূপভাবে ট্রেণ প্রভৃতি নিযুক্ত রাখাতে আমেরিকার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। জাহাজের অভাবেও ভারতের নিত্য-প্রয়োজনীয় লবণ, তুলা, বস্ত্র প্রভৃতির অনাগমনে ইহাদের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপে অর্থসঞ্চয় করিতেছে, তাহারা নিজেদের মিত্রদের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতবাসীদিগের মুদ্রা সঞ্চিত রাখিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়-পরায়ণ ও শক্তিশালী। যে টাকার সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, তাহা নিরাপদে নিয়োজিত করিবার অনেক সুবিধা আছে। ইহাতে সুদ পাওয়া যায় এবং ধনাধিকারীর ধনবৃদ্ধি হয়। বিদেশের সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহ ধনসঞ্চয় না করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ নানাভাবে নিয়োগ-দ্বারা বর্দ্ধিত করে। এইরূপে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদিগের দেশবাসী উপকৃত হয়। ভারতেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ও উপযুক্ত লাভে অর্থনিয়োগ করিবার অনেক সুবিধা আছে। উদ্বৃত্ত অর্থের শীঘ্র প্রয়োজন থাকিলে, লোকে তাহা ডাকঘরে Savings Bankএ জমা দিতে বা উহার দ্বারা ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে। যদি উহার শীঘ্র আবশ্যকতার সম্ভাবনা না থাকে, তবে war bond ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে ধনস্বামীর প্রত্যক্ষ লাভ হইবে এবং দেশেরও উপকার হইবে। কারণ, গবর্ণমেণ্টকে ঋণরূপে প্রদত্ত অর্থ, সৈন্যদিগের জন্য গম, চাউল, তুলা, পাট প্রভৃতি ক্রয়ের নিমিত্ত ভারতেই ব্যয়িত হইবে। ইহাতে সমগ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বিবেচনার অভাবে সংসারে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মুদ্রাসঞ্চয় এই সত্যের একটি দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, এ বিষয়ে একবার বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক দেশবৎসল ভারতবাসীই কেবল যে স্বয়ং সঞ্চয় হইতে বিরত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু যাহাতে দেশের পরম শত্রুগণের উপকার ও সাহায্য হইতেছে, অপরকেও সেই অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 663. November, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৩ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৫। নবেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান—শারদোৎসবে।

(মিশ্র খাম্বাজ)

আমি পরাই মাল্য আমার
প্রাণের ঠাকুরে!
রয়েছে যে নানাসাজে
নদী-গিরি-বন-মাঝে!
যাঁর বীণা রাত্রিদিনে
বাজে হৃদয়পুরে!
সে যে বাজে গুণো দুঃখে সুখে,
ঢেউয়ের দোলায় দোলে বুকে,
আমার প্রাণের দেবতা সে
আছে জগৎ জুড়ে!
তাঁরেই দেখি সকাল সাঁঝে
প্রাণে যতই বেদন বাজে,
অশ্রু-ধোওয়া পথে আমার
সে যে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে!

তাঁরই বাঁশী পাখীর গানে,
তন্দ্রা-আনা শাখীর তানে,
নিমেষ-হারা নীল আকাশে
কানন প্রান্তরে!
আমার ঠাকুর নাই তো ঘরে
আঁধার যেথায় নাহি সরে,
বিশ্ব-জুড়ে প্রকাশ তাঁহার
গন্ধে গীতে সুরে!
তাঁরেই আমি প্রণাম করি,
তাঁরই চরণ সদাই ধরি,
সবার সাথে সবার মাঝে
সে যে আছে কাছে দূরে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে এবং শনৈশ্চরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানে ব্যক্তিগণ সুন্দর অপত্যের কামনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস ইনি সুন্দর পুত্র দান করিয়া থাকেন্।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এক মাইল দূরে ভৈরবনাথের মন্দির অবস্থিত। ইনিই কাশীর কোতোয়াল। ইনি সর্ব্বদাই দণ্ড-পাণি। দণ্ডটী প্রস্তরের। কিন্তু এই দণ্ডটী ভৈরবনাথের মন্দিরে নাই; একটু দূরে অন্য মন্দিরে আছে। দণ্ডপাণির পূজা মঙ্গল ও রবিবারে হইয়া থাকে। দণ্ডপাণির দুই দিকে শুভ্রম ও বিভ্রম নামে দুইটী গণ আছে। কাশীখণ্ডে ও শিবপুরাণে লেখা আছে যে, হরিকেশ নামে জনৈক তপস্বী আনন্দবনে তপস্যা করিতেছিলেন্। শিব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কাশীর রক্ষক করেন ও শত্রুকে দণ্ড দিতে আদেশ দেন। বীরভদ্র ও অগস্ত্য-মুনি দণ্ডপাণির অপমান করাতে কাশীবাস হইতে বঞ্চিত হন। দণ্ডের সম্মুখে তিনটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। একদিকে একজন পূজারি ময়ূর-পাখার দণ্ড ধারণ করিয়া যাত্রীদিগের গাত্রে স্পর্শ করায়। এই স্পর্শের উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তগণ তাহাদিগের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পাপের শাস্তি পাইল এবং মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে স্বকৃত পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। ভৈরবনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে দুই দিকের দেওয়াল আলেখ্য-দ্বারা পরিশোভিত। দক্ষিণ দিকে ভৈরবনাথের একটি বড় আলেখ্য আছে। ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ নীল। ইহার পশ্চাতে একটি কুকুরের ছবিও আছে। কুকুর ইহার বাহন। দ্বারের বাম দিকে কুকুরের একটি বৃহৎ প্রতি-মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার উপরিভাগে বিষ্ণুর দশ অবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অবস্থিত।

ভৈরবনাথের মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে দুই পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তাহারা দ্বার-পালেশ্বর নামে খ্যাত। মন্দিরের মধ্যে তাম্র-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটীই ভৈরবনাথের আবাস-গৃহ। মূর্ত্তিটী প্রস্তরের কিন্তু মুখটী রৌপ্যের। ইহার চারিটী হাত। গলে পুষ্পহার। সন্নি-কটে একটি প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। পুরোহিত পার্শ্বে উপবেশন করেন ও লোকদিগের কপালে তিলক দেন্। তিলক দেওয়াকে হিন্দিতে কুঁদি বলে। এই মন্দিরে কুকুরের প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু অন্য মন্দিরে নাই। মন্দিরটী পুণার বাজিরাও-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরটীতে মহাদেব, গণেশ এবং সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। ইহাঁর সাত ভগ্নীরও মূর্ত্তি উক্ত মন্দিরে দেখা যায়। সমগ্র বারাণসী-ধামে শীতলা দেবীর ৪টী মন্দির আছে।

ভৈরবনাথের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে সামান্য দূরে এবং দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির অবস্থিত। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু, এই নয়টী নবগ্রহ নামে খ্যাত। মূর্ত্তি-

গুলি তিন শ্রেণীতে স্থাপিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটী করিয়া মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী সমস্ত দিনই রুদ্ধ থাকে, কেবলমাত্র প্রাতঃকালে পূজার জন্য উদ্ঘাটিত হয়।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া বামদিকের ফটক পার হইয়া যাইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত দণ্ডপাণির মন্দিরে আসা যায়। এখানে কালকূপ নামে একটী প্রসিদ্ধ কূপ আছে। প্রবাদ এই যে, এই কূপে যে-ব্যক্তি স্বীয় আস্য না দেখিতে পায়, তাহার ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। এখানে মহাকালের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পঞ্চপাণ্ডবের কল্পনা অতীব উত্তম। ভগবান্ এক যোগমায়া-দ্বারা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতসমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষকে উৎপাদন করতঃ আপনিই পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বররূপে সখিভাবে তাহাতে অধিবাস করেন্। শরীরজ কর্ম্মরূপ যে ফল উৎপন্ন হয়, তিনি তাহা আত্মরূপে ভোগ না করিয়া জীবরূপে তাহার ভোক্তা হয়েন। এখন বিষয়টীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত সমন্বয় করা যাইতেছে। এই পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ মহাভূত এবং যোগমায়া দ্রৌপদী। সাক্ষিরূপে সখিভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন্। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণ বলে। নর অর্থে লিঙ্গোপাধিক জীব, নারায়ণ অর্থে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা। উভয়েই সমানরূপ এবং অভেদ। অর্জ্জুন কেবলমাত্র ভোক্তা।—কৃষ্ণ ভোক্তা নহেন্। তিনি সারথ্যাদি ক্রিয়ার ছলে কেবলমাত্র প্রেরয়িতৃত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবদিগের সখা, পাণ্ডবদিগকে দেখেন মাত্র। সৃষ্টিসেতুভেদক শত দোষ নিবারণ করিবার জন্য তিনি দুর্য্যোধনাদি শত কুরুর এক ভীমের দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কামাদি শত দোষ একমাত্র বায়ুসাধন প্রাণায়ামেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং তিনি এক ভীমের দ্বারা কামাদি-দোষরূপ দুর্য্যোধনাদি একশত কুরুর বিনাশ করেন্। এখন পঞ্চপাণ্ডব ও পঞ্চভূতের গুণের দিকে দৃষ্টি করা যাউক্। তাহা হইলে বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এইগুলি পঞ্চভূত। পৃথিবীই সমস্ত ধর্ম্মের আধার-স্বরূপা এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা। এ-কারণ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাংশভূত ধর্ম্মরাজ বলিয়া খ্যাত। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। ভীম বায়ুস্বরূপ। মহাভারতেও ভীম বায়ুপুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন্। অর্জ্জুন আকাশস্বরূপ, এ-কারণ ইনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত। আত্মার সদৃশ আকাশ সর্ব্বব্যাপক। এজন্য কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরূপে বর্ণন করা হইয়াছে; অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই অর্জ্জুন। সর্ব্বভূতাপেক্ষা আকাশকেই ব্রহ্মসান্নিধ্য বলা যায়। ইহাই দেখাইবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং এই সন্নিধিপ্রযুক্ত সারথ্যে বৃত হইয়া তিনি এক রথে সহবাস করিয়াছেন। সারথি বলাতে কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গতি, অতএব ভূতের জড়ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব জল ও অগ্নিস্বরূপ। এ-কারণ অশ্বিনীকুমারের পুত্র বলিয়া ইহাঁরা উক্ত হইয়াছেন্। সূর্য্যতনুজ অশ্বিনীকুমার জলাগ্নিরূপ। কারণ, সূর্য্য হইতে জলের এবং অগ্নির উৎপত্তি হয়।

জলের গুণ শীতলতা ও আর্দ্রতা। নকুলে তাহা বিদ্যমান আছে। অগ্নির গুণ রূপ; সুতরাং সহদেব অত্যন্ত রূপবান্ এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অগ্নিস্বরূপ বলা যায়। শরীর-ধারণার্থ পঞ্চীকরণ-প্রস্তাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিকে এবং অংশানুসারে ঐশ্বরী শক্তি লইয়াই দ্রৌপদী যোগমায়ারূপা। ইনি আত্মার সখী অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী মায়া। দ্রৌপদীকেও শ্রীকৃষ্ণ সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন্। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত না থাকিয়া তৎসন্নিধানস্থা হইয়া বিশ্বকার্য্যকে চেতনবৎ সম্পাদন করেন, সেইরূপ দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণে লিপ্তা নহেন; কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে থাকিয়া পঞ্চপাণ্ডবাখ্য পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ-রূপে অংশানুসারে একত্র করিয়া রাখিয়াছেন্। লোকে বলে পাণ্ডবগৃহিণী দ্রৌপদী। ফলে প্রকৃতিরূপে মহামায়া ভগবদিচ্ছানুসারে বিশ্বকার্য্যের সম্পাদিকা হইয়াছেন্। নতুবা এক স্ত্রীর পঞ্চপতি কি সম্ভব? ইহা যেমন লোকবিরুদ্ধ তেমনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং, রূপকচ্ছলে পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে পঞ্চপাণ্ডবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত। সন্নিধানস্থা মায়া স্বীয় গুণে তাঁহাকে গুণবান্ করেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্ক্রিয়; দ্রৌপদী-সন্নিধ্য থাকায় পাণ্ডবার্থ বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপকরণ সামর্থ্যরহিত, কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন। "যুদ্ধে তিষ্ঠতীতি যুধিষ্ঠিরঃ।" বিনা যুদ্ধে পৃথিবী স্থির থাকেন না। পৃথিবীর অংশ বলিয়া পাণ্ডবরাজকে যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত করা হইয়াছে।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া "দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি" শ্রুতির অবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভীম ও অর্জ্জুন স্কন্ধশাখা। অর্থাৎ বৃক্ষাবয়বের ধারক স্কন্ধ। সুতরাং, সমস্ত দেহের ধারক বায়ু। 'শাখা'-পদে বিস্তার বুঝায়। বিস্তার আকাশ ভিন্ন অন্য নহে। এ-কারণ ভীমার্জ্জুনকে স্কন্ধশাখা বলা হইয়াছে। ফলপুষ্প-পদে রূপ ও রস। পুষ্পের সুদৃশ্যতা-প্রযুক্ত সহদেবের সৌকুমার্য্য। ফলের রস জলীয়াংশ, তৃপ্তিকারক। এ-কারণ নকুলকে ফল কহিয়াছেন। অর্থাৎ জলেই শরীরকে সুতৃপ্ত করিয়া থাকে। যেমন শরীরের সমস্ত অবয়ব জলপ্রিয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুলপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা। তাঁহার সত্তাতেই পাণ্ডবগণ সচেতন হইয়া আপন আপন অধিকারগত কর্ম্ম করিয়াছেন। যেমন শ্রুতি-প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বর শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজ-কর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু ফল আপনি ভোগ না করিয়া জীবকেই ভোগ করান্, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু রাজ্যফল আপনি ভোগ না করিয়া অর্জ্জুনকেই ভোগ করাইয়াছেন্।

বারাণসীধামে যে-সকল লোক তীর্থ করিতে আসে, তাহাদিগকে একবার মণিকর্ণিকাতে আসিতেই হইবে। অন্ততঃ পক্ষে শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ। মণিকর্ণিকা একটী কূপমাত্র। ইহার জল পূতিগন্ধবিশিষ্ট হইলেও পাপবিমোচক বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস।

মহাপাপীও ইহার জলে বিগতকল্মষ হয়। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, বিষ্ণু এই কূপটী স্বীয় চক্রদ্বারা খনন করেন, সেই জন্য ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী। কূপ-খনন করিয়া জলের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু স্বীয় ঘর্ম্ম-দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করেন্। পরে তিনি উত্তর দিকে যাইয়া যোগ-সাধনে রত থাকেন্। ইতোমধ্যে মহাদেব এখানে আসিয়া কূপটী দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হয়েন। তিনি দেখিলেন যে, কূপমধ্যে কোটী সূর্য্যের প্রকাশ রহিয়াছে। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হন্। বিষ্ণু তখন এই বর প্রার্থনা করেন যে, মহাদেব উক্ত কূপটীতে তাঁহার সহিত বাস করিবেন্। এই প্রার্থনায় মহাদেবের এত আনন্দ হয় যে, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে থাকে। এই কম্পন-নিবন্ধন মহাদেবের কর্ণের কুণ্ডল কূপে পতিত হয়। এই নিমিত্ত কূপের নাম মণিকর্ণিকা হয়। ইহার অপর একটী নাম মুক্তিক্ষেত্র এবং পূর্ণ-শুভকরণ। মহাদেব এই কূপটীকে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত করেন। মণিকর্ণিকা-সম্বন্ধে কাশীখণ্ডের কথা আমরা বলিয়াছি; এখন লোকপ্রবাদ কি তাহাও বলিতেছি। একদা হর-পার্ব্বতী কূপের সন্নিকটে উপবেশন করিয়া আছেন্, এমন সময়ে পার্ব্বতীর কর্ণ হইতে আভরণ চ্যুত হইয়া কূপে পতিত হইল। তদবধি মহাদেব কূপটীকে মণিকর্ণিকা আখ্যা দেন। কূপের চারিধারে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দ্বারা জলে অবতরণ করা যায়। উত্তর দিকের সিঁড়ির ধাপে বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। কূপের মুখের পশ্চিম দিকে পিতৃদিগকে জল দিবার ১৬টী স্থান আছে। কূপোদক পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট।

মণিকর্ণিকা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনিই মৃত্যু-কালে মানবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করেন্। ইঁহার মূর্ত্তিটী ভূঙ্গারের মধ্যে রক্ষিত। বর্ষাকালে স্থানটী নদীজলে নিমজ্জিত হয় ও তদবস্থায় বিগ্রহটীকে কয়েক মাস থাকিতে হয়। এইজন্য মন্দিরের ভিত্তি দুর্ব্বল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী উচ্চ স্থানের মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তরের দুইটী পদচিহ্ন আছে। ইহা চরণপাদুকা নামে খ্যাত। পদচিহ্নটী বিষ্ণুর। প্রবাদ এইরূপ যে, বিষ্ণু এই স্থানটীতে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে চরণপাদুকা পূজার জন্য লোকের অনেক ভিড় হইয়া থাকে। বরুণা-নালায়ও অনুরূপ পাদুকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের দ্বিতীয় থাকের সিঁড়ি চড়িলে সিদ্ধবিনায়কের মন্দিরে পঁহুছিতে পারা যায়। সিদ্ধবিনায়ক গণেশ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নহেন। মূর্ত্তিটী লাল; ত্রিনেত্র; গলে ফুলের মালা। মস্তকটী হস্তীর। ইঁদুর ইহার বাহন। মন্দির-মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী রমণীমূর্ত্তি আছে। ইঁহারা সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামে খ্যাত।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের সন্নিকটে সিন্ধিয়া ঘাট এবং নাগপুর-রাজার ঘাট। পূর্ব্বোক্ত ঘাটটীর উপর একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা অবস্থিত। তাহার গুরুভারে ঘাটটী বসিয়া গিয়াছে।

বারাণসীর উত্তর দিকে বৃদ্ধকালের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন। প্রবাদ এইরূপ যে, সত্যযুগে জনৈক বৃদ্ধ রাজা জরাগ্রস্ত

হইয়া বারাণসীধামে আগমনপূর্ব্বক তপস্যায় রত হন্। মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জরামুক্ত করেন্ ও পুনরায় যৌবন দেন। এই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থ রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৃদ্ধকাল আখ্যা দেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে, বৃদ্ধকালের পূজা করিলে একদিকে লোকে যেমন জরামুক্ত হয়, তেমনই অন্যদিকে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। বারাণসী-ধামে সর্ব্বাপেক্ষা যে সকল পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দির একটি।

এখান হইতে সিড়ি ভাঙ্গিয়া মহাবীরের মন্দিরে যাইতে হয়। ইনি হনুমানের মূর্ত্তি। বিগ্রহটী লাল। ইহার সন্নিকটে কালীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী খণ্ডমূর্ত্তি আছে। কালীর দক্ষিণদিকের দেওয়ালে গণেশ ও পার্ব্বতী, বামে ভৈরব, সূর্য্য, হনুমান, নারায়ণ (বিষ্ণু), এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীর মন্দিরের বিপরীত দিকে দুইটী কূপ আছে। তন্মধ্যে একটী অম্লোদক এবং তাহার জলও পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ু হইবার প্রত্যাশায় ইহাতে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, কুষ্ঠরোগিগণ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া এখানে স্নান করিলে সেই রোগ হইতে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় কূপটীর জল পান করিতে হয়। কূপোদক মিষ্ট। এখানে অন্যান্য দেবতারও প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহাদিগের সংখ্যা নয়টী। ইহার মধ্যে দুইটী সতীমূর্ত্তিও আছে। পূর্ব্বকালে স্বামীর বিয়োগে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এই দুই প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

এই চত্বরের দক্ষিণদিকে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। বিগ্রহটীর অঙ্গে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সর্প বিজড়িত। ইনি নাগেশ্বর নামে খ্যাত। এই চত্বর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় চত্বরে যাওয়া যায়। এখানে দুইটী অশ্বত্থ ও একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। এখানে কোন মন্দিরাদি নাই। সন্ন্যাসিগণ এখানে অবস্থান করেন্। ইহার সন্নিকটে আর একটী চত্বর আছে। এখানে বৃদ্ধকালের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকাল একটী ভূগর্ভের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপর ঝারা দেওয়া হয়। বৃদ্ধকাল একটি শিবলিঙ্গ মাত্র। বারান্দায় গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সন্নিকটে মার্কণ্ডেশ্বর ও দক্ষেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাদেবের অনুকম্পায় মার্কণ্ডেয় অমর হন্। তাই তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহাদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। কাশীখণ্ডে দক্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারণ, দক্ষযজ্ঞের ঘটনা সকলেই জানেন্। বৃদ্ধকালের মন্দিরের মধ্যে দক্ষেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। বৃদ্ধকালের মন্দিরের সংলগ্ন অন্নমুক্তেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় প্রতি-রবিবারে একটি মেলা হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে বৎসরে একটি করিয়া বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী শ্রাবণ মাসে হয়।

বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় রত্নেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ বারাণসী-সহরের উন্নতি-কল্পে রত্নেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা প্রকটিত করেন। মহাদেব স্বপ্নে ম্যাজি-ষ্ট্রেটকে দেখা দেন ও বলেন, যেন তাঁহার

মন্দির ভগ্ন করা না হয়। প্রত্যুষে উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মন্দির-ভগ্নাজ্ঞা রহিত করেন।

* * *

বারাণসী-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে রাজা দিবোদাসের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। একদিন এমন ছিল যে, বারাণসীধামে মহাদেবের পূজা না হইয়া রাজা দিবোদাসের পূজা হইত। কাশীখণ্ডে লেখা আছে, ব্রহ্মার বরে রাজা দিবোদাস ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের উপর সমভাবে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন্। দেবতাদিগের কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন্। মহাদেব অনেক চেষ্টার পর গণেশকে উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুমতি দেন। গণেশই রাজা দিবোদাসের পতনের মূল। দিবোদাস রাজ্যচ্যুত হইয়া কৈলাসে নীত হন্।

মীরঘাটের সামান্য দূরে দিবোদাসেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। এখানে অন্যান্য দেবতাও আছেন। তন্মধ্যে একটীর নাম বিশবাহুক। ইঁহার কুড়িটী হস্ত। মন্দিরের সম্মুখে একটী দীপাধার আছে। সময়ে সময়ে তাহা দীপ্ত করা হয়। মন্দিরের সীমানার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। এই কূপের সম্মুখে অন্যান্য পঞ্চদেবতার স্থান। দ্বারের সম্মুখে মহাদেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। ইহা চারি ফিট উচ্চ। উক্ত পঞ্চদেবতার স্থানের মধ্যে পঞ্চমুখ শিবের বিগ্রহ দেখা যায়।

মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় আসিলেই দেখা যায় যে, অনতিদূরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। বিশালাক্ষী পার্ব্বতীর অন্য একটি নাম। এখান হইতে কিছু দূরেই মীরঘাট। ঘাটটী ক্ষুদ্র। এই ঘাটের দক্ষিণ কোণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। কৃষ্ণ বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার গলে বনফুলের হার।

অওসানগঞ্জের সংলগ্ন নাগকুয়া-মহল্লায় "নাগকূপ" নামে একটী কূপ আছে। কূপটী অতিপুরাতন। কবে যে ইহা খাত হইয়াছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু কাশীখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। এখানে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। সিঁড়িতে প্রস্তর-নির্ম্মিত তিনটী সর্প-মূর্ত্তি দেখা যায়। মহাদেবের বিগ্রহেও সর্প বিজড়িত আছে। বৎসরে একবার করিয়া এখানে মেলা হয়। শ্রাবণ মাসের ২৪ ও ২৫শে মেলাটী হইয়া থাকে। প্রথম দিনে রমণীগণ ও দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ এখানে আসিয়া নাগেশ্বরের পূজা করেন। সিঁড়ির দক্ষিণদিকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। তাহার তলে অনেকগুলি দেবতামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি অবস্থিত।

নাগকূপের সামান্য দূরে জাইতপুরা-মহল্লায় "বাগেশ্বরীর" মন্দির আছে। তাঁহার মুখটী অষ্টধাতু-দ্বারা নির্ম্মিত। ইঁহার মস্তকে মুকুট, অঙ্গে বসন ও গলে ফুলহার। ইনি সিংহবাহিনী। চত্বরের মধ্যে একটি সিংহ-মূর্ত্তিও দেখা যায়। আমেটীর রাজা লাল বাহাদুর সিংহ উক্ত সিংহ-মূর্ত্তিটী দান করিয়াছেন্। উক্ত রাজা-সাহেব প্রদত্ত আরও চারিটী সিংহমূর্ত্তি চারিটী স্থানে দেখা যায়। তন্মধ্যে একটী দুর্গাকুণ্ডের মন্দিরে, একটী

বাঙ্গালী-টোলাস্থিত চৈলখী-দেবীর মন্দিরে, একটী বুলহানালাস্থিত সিদ্ধিমাতা-দেবীর মন্দিরে এবং চতুর্থ সিংহমূর্ত্তিটী গুজরাতী পণ্ডিত গোরজীকে প্রদত্ত হয়। বাগেশ্বরীর মন্দিরের দেওয়ালে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি অবস্থিত। তন্মধ্যে একদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে বাগেশ্বরীর বাহন "অগওয়ানে"র মূর্ত্তি। তৃতীয় থাকে সিংহপৃষ্ঠে বিন্ধ্যাচল দেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। এখানকার ঠাকুর দোয়ারের একটী কামরায় একটী গণেশমূর্ত্তি, নবগ্রহমূর্ত্তি, ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে। হনুমানের স্কন্ধের উপর রামলক্ষ্মণ অবস্থিত।

এখানকার মন্দিরের সীমানার মধ্যে অন্য দুইটী মন্দির আছে। তাহাতে জরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মূর্ত্তি দেখা যায়। ব্যাধি-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ জরহরেশ্বরের মন্দিরে পূজা করে ও ব্যাধিমুক্ত হইলে দুধ ও ভাং (সিদ্ধি) চড়াইবার কামনা করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন।

(সামাজিক নাটক)

চরিত্র।

পুরুষ।

হেমচন্দ্র ঘোষ	জমীদার।	মণীন্দ্র রায়	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল পুত্র।
সুবোধ	জমীদার-পুত্র।		
সর্ব্বেশ্বর	ঐ কর্ম্মচারী।	ভোলানাথ	মণীন্দ্রের খুল্লতাত।
হরিদাস	ঐ পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।	প্যারিচাঁদ, হারাধন, গোবর্দ্ধন	মণীন্দ্রের তিন ইয়ার।
নন্দলাল বসু	গৃহস্থ ব্যক্তি।		
প্রফুল্লকুমার	গৃহস্থ-পুত্র (মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ছাত্র)	নরেন্দ্রকৃষ্ণ	শ্যামনগরের জমীদার।
বিজয়কুমার মিত্র	প্রফুল্লের বন্ধু।	জহরলাল	ঐ কর্ম্মচারী।

ঘটক, ভৃত্য, দ্বারবান্, ফলটেবল ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	হেমচন্দ্রের স্ত্রী।	লীলা	মণীন্দ্রের স্ত্রী।
রমা	ঐ কন্যা।	জয়াবতী	মণীন্দ্রের মাতা।
সুকুমারী	নন্দলালের স্ত্রী।	সরলা	দরিদ্রা গ্রাম্য-রমণী।

ঘটকী, দাসী, পরিচারিকা, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর ;—

অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্নপূর্ণা। আজ দশ দিন হ'ল তবুও তাঁর কোন খবর পেলুম না কেন? এমন ত কখন করেন্ না! যদি কোথাও যান্, দু'দিন দেরী হ'লে আমি খবর দেন্; চিঠি লেখেন্। এ-বারে এমন কল্লেন কেন? মহলের গোল-মাল হয়েছে ব'লে মহলে গেলেন; বল্লেন্, দু'তিন দিন দেরী হবে; কিন্তু আজ দশদিন হ'য়ে গেল, এলেনও না, কোন খবরও দিলেন্ না! কেন, কি জানি, প্রাণটা আমার কেবল কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে। যেন কি অমঙ্গল ঘ'টেছে ব'লে মনে হচ্ছে! হে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন! হে কুলদেবতা! আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তাঁর যেন কোন অমঙ্গল ঘটে না, প্রভু!— কাল হরিদাস ব'ল্লে সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এসেছে, তিনি কাল আসবেন্! কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ত' আমাকে কিছু ব'লে পাঠায় নি! অন্য বারে যখন মহলে যান্, তখন সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এলে পরে, সর্ব্বেশ্বর আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এবারে কেন তা দিলে না! তবে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছে? তাঁর কি অসুখ ক'রেছে? কি জানি, আমার প্রাণ কেন এমন ক'চ্ছে? কিছুতেই যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরিদাস! কাল তুমি যে ব'ল্লে তাঁর চিঠি এসেছে, তা সত্যি কি?

হরি। সত্যি বই কি, বৌঠাকরুন্!

অন্ন। তিনি ভাল আছেন?

হরি। হ্যাঁ, ভাল আছেন বৈ কি! আপনি কেন এত ভাবছেন?

অন্ন। কেন ভাব্‌ছি? কি জানি হরিদাস! আমার প্রাণের ভেতর আজ কেমন ক'চ্ছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কেন এমন হচ্ছে!

হরি। আপনি এত উতলা হবেন না। এখুনি বাবু এসে পড়্‌বেন্। সর্ব্বেশ্বরবাবু এষ্টেসনে লোক পাঠিয়েছেন্।

অন্ন। লোক পাঠিয়েছেন? তা আমাকে কোন কথা বলেন নি কেন?

হরি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাছে। দেখি।—

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া)

ঐ যে বাবু আস্‌ছেন!

অন্ন। কই? কই? (নেপথ্যে দেখিয়া) তাই ত। আস্‌ছেন্, কিন্তু অত বিমর্ষ কেন? কি হয়েছে! কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

[হেমচন্দ্রের প্রবেশ।]

হেম। অন্নপূর্ণা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার সব গিয়েছে। যাকে বড় বিশ্বাসী জ্ঞান ক'রে, সর্ব্বে-সর্ব্বা ক'রে রেখে আমি আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম্, আমার সেই পরম হিতৈষী আপন ভগ্নীপতি সড় ক'রে মহল নীলাম করিয়ে নিজে বেনামিতে কিনে নিয়েছে! সব্ নিয়েছে, আমাকে পথের ভিকিরী করেছে! আমার কি হবে অন্নপূর্ণে! আমি কি ক'রে সংসার প্রতিপালন কোর্ব্বো? আমি যে কিছুই ভেবে ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না!

অন্ন। সে কি কথা! কি সর্ব্বনাশ!

হেম। হা ভগবন্! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অন্ন। ও কি কথা! অমন অলুক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে কি! বিষয় গেছে যাক্। আবার বিষয় হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কেন? তোমার শরীর ভাল থাক্। তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে, আবার সব হবে। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) আমার মাথা খাও, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও। অমন কোরো না।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা! আমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি, সব গেল! আমি স্থির হব! ঠাণ্ডা হব! অন্নপূর্ণা! স্থির হয়েই আছি, ঠাণ্ডা হ'য়েই গেছি। আমি পাষাণ; নইলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছি! আমি যে পাগল হয়ে যাই নি, এই আশ্চর্য্য!

অন্ন। কি ক'র্ব্বে? ভেবে কি হবে? লক্ষ্মী-জনার্দ্দন যা কোর্ব্বেন্, তাই হবে।

হরি। ভাবনা কি বাবু! আপনার ত ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।—তাই থেকে কত টাকা আস্‌বে; আবার বিষয় কিন্‌বেন। ভগবান্ অবিশ্যি, মুখ তুলে চাইবেন্। অকৃতজ্ঞ লোকে ঠকিয়েছে, তিনি ঠকাবেন্ না! আপ্‌নি ভেবে কি কোর্ব্বেন্? তাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন্।

হেম। হরিদাস! আমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত সম্পত্তি সব গেল রে! আমি কি দিয়ে আর বিষয় কোর্ব্বো? কি ক'রেই বা তোমাদের প্রতিপালন কোর্ব্বো?

হরি। ভয় কি? কেন আপনি কাতর হ'চ্ছেন? বিষয় গেছে, গেলই বা! ব্যবসাতে এইবার ভাল ক'রে মন্ দিন্। আপনি নিজে কল-কারখানাগুলো দেখুন, তাতেই বেশ সংসার চ'লে যাবে। না হয়, দু'দিন একটু কষ্ট হবে। আপনি নিজে যদি পাটের ব্যবসাটা দেখেন, তা' হলে দু'দিনে কতটাকা ঘরে আস্‌বে।

অন্ন। হ্যাঁ, তাই কোরো। হরিদাস যা বল্‌ছে, তাই শোন। ভেবে ত আর উপায় নেই? ভাব্‌লে ত আর কোন ফল হবে না? তখন কেন মিছি মিছি, ভেবে শরীরটে মাটি কোর্ব্বে? তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে পর, সব হবে।

হেম। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, অন্নপূর্ণা! তাই কোর্ব্বো। বিষয় গেছে, তাতে তোমাদের যে-কালে দুঃখ হয় নি; তখন আমিও দুঃখ কোর্ব্বো না! তোমাদের সুখেই আমার সুখ, তোমাদের দুঃখেই আমার দুঃখ।

(সুবোধের প্রবেশ)

সুবোধ। বাবা, বাবা, আমার জন্যে কি এনেছেন্? দুটো ময়ূর আন্‌বেন্ বলেছিলেন, এনেছেন্?

হেম। (নিরুত্তর)

সুবো। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) চুপ করে রইলেন্ কেন, বাবা? কথা কইছেন না কেন? কি এনেছেন্? হরিণ এনেছেন্? আমার হরিণটা মরে গেছে; আমার একটা হরিণ চাই।

হেম। হরিদাস! তোমরা আমাকে স্থির হ'তে বল্‌ছ, ভগবান্ আমাকে স্থির হতে দিচ্ছেন কই? এই আমার নয়নের মণি সামান্য একটা জিনিষের জন্যে এমি আব্দার ক'র্ব্বে, আর আমি অচল পাষাণের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?? ভগবান্ আমার বাক্‌শক্তি ত রহিত করেন্ নি?

হরি। (সুবোধের প্রতি) চল সুবোধ! আমি ময়ূর এনে দোব, আমার সঙ্গে এস।

অন্ন। যাও বাবা! তোমার হরি-কাকার সঙ্গে বেড়িয়ে এস। তোমার দিদি কোথায়? কি কচ্ছে?

সুবো। দিদি তার খরগোস নিয়ে খেলা ক'চ্ছে। আমার হরিণটা ম'রে গেল! বাবা আমাকে আর একটা হরিণ কিনে দিলেন না! দিদির চারটে খরগোস্!

হরি। চল, চল, আমি দোব এখন। হরিণের জন্যে আবার ভাবনা কি?

[সুবোধকে লইয়া হরিদাসের প্রস্থান]

(নেপথ্যে) বাবু!—

হেম। কে ও? সর্ব্বেশ্বর?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেম। কি বল্‌ছ? ভিতরে আস্‌তে পার।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ;—অবগুণ্ঠন দিয়া অন্নপূর্ণা একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

সর্ব্বে। (বিচলিত স্বরে) বাবু,—বাবু, বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত! আমাদের পাটের গুদামে আগুন লেগেছে। এইমাত্র সরকার এসে ব'লে গেল। কি হবে বাবু! কি উপায় করা-যাবে?

হেম। আগুন লেগেছে? বে-শ হয়েছে। সু-সং-বা-দ-এনেছ। আর কিছু সংবাদ নেই সর্ব্বেশ্বর? যাগ্-যাগ্, সব যাগ্; আমি যাই, তুমি যাও, সুবোধ যাগ্, রমা যাগ্! একেবারে সব যাগ্। একদিন ত সব যাবেই, তবে আর মায়া কেন?

সর্ব্বে। অমন ক'চ্ছেন্ কেন বাবু? স্থির হোন্!

হেম। তোমরা সবাই বল্‌ছ স্থির হ'তে! আমি স্থির ত' হ'য়েই আছি! অস্থিরতার আর কি দেখ্‌লে তুমি? এইমাত্র হরিদাস আমায় বুঝিয়ে গেল, পাটের ব্যবসায় চালাতে! তাতেই দুঃখ দূর হবে; আবার বিষয় আশয় হবে। আবার তুমি খবর আন্‌লে গুদোমে আগুন লেগেছে!

সর্ব্বে। আপ্‌নি স্থির হোন্; যাতে গুদোমের অবশিষ্ট মাল রক্ষা হয়, তার একটা উপায় করুন্।

হেম। উপায় আমি কি কোর্ব্বো সর্ব্বেশ্বর? উপায় ক'চ্ছেন্ নারায়ণ!

সর্ব্বে। কি করা যাবে, অনুমতি দিন্!

হেম। অনুমতি? অনুমতি আমি কি দোব বল? আগুনকে ব'ল্‌ব কি, তুমি নিবে যাও?

সর্ব্বে। না, না, তবে আমি যাই; দেখি গে, যদি কোন উপায়ে কিছু রক্ষা ক'র্ত্তে পারি। তবে আমি চল্লুম্!

[হেমচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রস্থান]

হেম। অন্নপূর্ণা! দেখ্‌লে বিধাতার খেলা? যার যখন যায়, তখন তার এম্নি ক'রেই কি সব যায়?

অন্ন। ভেবে আর কি হবে? আবার সব হবে। আমার গয়না আছে, টাকা আছে, তাতেই এখন চল্‌বে। আবার সব হবে।

হেম। অন্নপূর্ণা! এতদুঃখেও তোমার সহিষ্ণুতা দেখেও আনন্দ হয়।

অন্ন। চল, মুখে হাতে জল দেবে চল।

(অন্নপূর্ণা হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠকখানা। মণীন্দ্র, প্যারিচাঁদ, হারাধন ও গোবর্দ্ধন।)

মণি। বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি? বড়

আস্পর্দ্ধা বেড়েছিল! এত অহঙ্কার! এত দর্প! বাবা! যা রয় সয়, তাই ভাল! অতি-বাড় বিড় নয়! এখন কেমন হয়েছে? যেমন কর্ম্ম তেমি ফল!

গোব। পাপ কল্লেই বাড়ে বল!

হারা। ও কি? তুমি বল্‌তে পার্লে না, বাবা! পাপ কর্লে ই ভুগ্‌তে হয়!

গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা, যা! তুই বড় পণ্ডিত হয়েছিস্!

প্যারি। ও-সব কথা-কাটাকাটি রাখ্। আজ আনন্দের দিন, আমোদ কর, আমোদ কর! এস, সবাই মিলে আজ প্রাণ ভ'রে ফুর্ত্তি করা যাগ্।

গোব। কেন হে? কি হয়েছে? ব্যাপার-খানা কি?

প্যারি। ব্যাপার আর কি? শত্রু-দমন হয়েছে।

হারা। কে, কে, শত্রু কে? কা'র কি হয়েছে?

মণি। আরে ঐ হেম-ঘোষটা! ওটার কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে ওটা অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখ্‌ত! এখন সব গিয়েছে,... মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

হারা। অ্যাঁ? বল কি! কি করে গেল? কি ক'রে গেল?

প্যারি। ওটার ভগ্নীপতি...কালেক্টা-রির খাজনা দেয় নি, বলে সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিকিয়ে গেছে।

মণি। সেও আমার ফন্দি! সেও আমার ফন্দি!

হারা ও গোব। (হাসিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—! বেশ হয়েছে,—বাবা! বেশ হয়েছে। তা—তোমাদের—আমাদের সঙ্গে বিবাদটা,—শত্রুতাটা—কি ক'রে হয়েছিল?

মণি। আরে, ওর একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে না?

গোব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছেই ত, আছেই ত! তার কি হ'য়েছে?

মণি। হেম ঘোষের সঙ্গে আমার বাবার বেশ ভাব-সাব ছিল। বাবা সেই মেয়েটাকে দেখে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ব'লে-ছিলেন। ... বলে কি না, এত ছোট মেয়ের আমি বিয়ে দোব না।

হারা। তাই ত। ইঃ-স্, কি আস্পর্দ্ধা! কচি খুকি মেয়ে আর কি?

মণি। শুধু কি তাই? ওর স্ত্রীটা আবার বলে কি না,—মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দোব, তবু মাতালের হাতে দোব না!

প্যারি। এইবার কেমন জব্দ? দে জলে ফেলে!

হারা। কে মাতাল? মণিবাবু? মণি-বাবুকে মাতাল বলে? যে বলে তার সাত-পুরুষ মাতাল, চোদ্দপুরুষ মাতাল!

মণি। তারপর শোন না! বাবা ত হঠাৎ মারা গেলেন। মা কল্লে কি না, একটা কালিন্দী কুটুরে পেঁচীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে! আমার কি এতে রাগ হয় না?

হারা ও গোব। হবে না? এক-শ' বার হবে, হাজার বার হবে, লক্ষ বার হবে।

মণি। বাবা! আমার সেই রাগ বরাবর মনে ছিল! আমি কি সহজে ভুলি?

হারা ও গোব। তা কি পারেন্? তা কি পারেন্? এত বড় কথাটা কি মানুষে ভুল্‌তে পারে?

মণি। তা'র ঐ ভগ্নীপতি,যে ওর বিষয়ের ম্যানেজার ছিল, সে হ'চ্ছে, আমার মামাত ভাই। তা'কে হাত কর্লুম। আমিই তা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একাজ করিয়েছি। নইলে সে ত একটি আস্ত ম্যাড়াকান্ত! তার কি এত সাহসে কুলোয়?

প্যারি। বাবা, আবার শুন্‌ছি ব্যাটার পাটের গুদামে আগুন লেগে গেছে।

মণি। এইবার "অদ্য তক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" হবে। যদি আমার হাতে কিছু টাকা থাক্‌ত, তা হ'লে আমিই বিষয়টা ভেঙ্কে নিতুম্। তা পার্লুম না; আমার যে খরচ! সেই তা'র খুড়োর নামে কিনে নিয়েছে।

হারা। বেশ হয়েছে! এইবার দেখা যাবে কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দেয়?

গোব। এইবার আমাদের মণিবাবুর পায়ে ধ'র্ত্তে হবে।

হারা। ওঁর ত' বিয়ে হয়ে গেছে! উনি কি আর বিয়ে ক'র্ত্তে পারেন?

গোব। রাম! রাম! তাও কি পারেন?

মণি। পারি না কি-রকম? আলবৎ পারি!

হারা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা পারেন্ বৈ কি! খুব পারেন্! মনে ক'র্লেই পারেন।

প্যারি। নাও, নাও, শত্রু-নিপাত-কামনায় সব এক এক গ্লাস টান।

হারা। দাও-ভাই! আমার একগ্লাসে সানাবে না, বোতল শুদ্ধ দাও। (বোতলে মদ্যপান)

প্যারি। নাও, মণিবাবু, তুমি আজ বেশী ক'রে খাও। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই, বাবা! লাখ-পতিকে ভিখিরী ক'রে দিয়েছ!

(সকলের মদ্যপান)

মণি। এখনও আমার রাগ যায় নি। তার সেই মেয়েটাকে ধ'রে এনে আমার এই পা টেপাতে পারি, তবেই আমার গায়ের জ্বালা যায়।

প্যারি। হ্যাঁ, টেনে এনে পা টেপাতে হবে বই কি!

গোব। এত বড় আস্পর্দ্ধা! বলে কি না মাতালের হাতে দোব না?

মণি। মদ খাই, আমার বাবার পয়সায় খাই; তোর বাবার তাতে কি রে...?

হারা। তোর বাবার কি রে...?

প্যারি। খাও বাবা, আজ শত্রুর কল্যাণে বেশী ক'রে খাও। ফূর্ত্তি কর, ফূর্ত্তি কর! (মদ্য-পান ও অপর সকলকে দান)। একটা গান গানা ভাই! নইলে আসরটা জম্‌ছে না!

[হারাধন ও গোবর্দ্ধন উঠিয়া দাঁড়াইল]

(রুদ্রমূর্ত্তি ভোলানাথের বেগে প্রবেশ।)

ভোলা। দাঁড়া ব্যাটাচ্ছেলে! আসর জমাচ্ছি ভাল ক'রে। ব্যাটা, এখানে আড্ডা-বাড়ী পেয়েছ? ম'গে! একেবারে বয়ে গেলি, হতভাগা? বাড়ীতে এ সব কি কাণ্ড! দাদা মারা গিয়ে অবধি যেন কি হয়ে উঠেছিস্! সর্ব্বস্ব এরি মধ্যে ওড়ালি, ছোট ছোট ভাই-বোনগুলো রয়েছে, তাদের কি দশা হবে, সে ভাবনা নেই; ঘরে সোমত্ত বউ রয়েছে, তাকে চ'খে দেখা নেই; বাড়ীতে আমরা রয়েছি, লজ্জাসম্মান নেই? বেরো বাড়ী থেকে, হতভাগা কোথাকার!

মণি। কি এ-ম-ন অ-ন্যা-য় কা-জ-টা ক-রে-ছি?

ভোলা। তবেরে পাজী ব্যাটা! ভদ্র-

লোকের বাড়ীতে ব'সে মাতলামী? দুঃত্তোর মাতালের মুখে আগুন। মদের মুখে মারি লাথি!

[প্যারির নিকট হইতে মদের বোতল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল।]

প্যারি। আহা হা! সব নষ্ট ক'লে, সব নষ্ট ক'লে!

ভোলা। দূর-হ—দূর-হ,—বেরো বাড়ী থেকে। (ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।)

মণি। আহা, ওদের মেরো না কাকা! মারতে হয়, আমাকে মার।

ভোলা। একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস্? দেখ্ ম'লে! যদি ভাল চাস্ ত' খবরদার, আর এমন কাজ করিস্ নে। এবার যদি বাড়ীতে এ-সব দেখি, তা হ'লে তোকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দোবই। তুই হ'লি কি? দাদার নাম ডোবাতে বসেছিস্? একেবারে গোল্লায় গেছিস্?

[ভোলানাথের প্রস্থান]

মণি। খুড়ো গাইলে মন্দ নয়। কি বল হে?

প্যারি। বাবা, আমাকে যে ধাক্কা দিয়েছে, আমি তাই সাম্‌লে গেছি! অপর কেউ হ'লে চিৎপাত্ হ'ত!

গোব। আর একটু টান, তা হ'লেই সব ভাল হ'য়ে যাবে। আমাদের ও-সব ঢের সওয়া আছে।

প্যারি। খাব কি? খুড়ো কি আর কিছু রেখেছে? আহা! বোতলটা না ভেঙ্গে যদি আর দু'খা মারত, তাহলেও ভাল ছিল। একটুও রাখে নি, বোতলশুদ্ধ চুরমার!

মণি। থাকি তুই? আমার আলমারীতে আছে। বার ক'র্ত্তে ভয় হ'চ্ছে; কি জানি আবার যদি এসে পড়ে?

গোব। চল মণিবাবু! একটু বাইরে যাওয়া যাক্। ঘরের ভিতরে আর ভাল লাগে না।

মণি। আমার মাথা ঘুরছে, গা টল্‌ছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

প্যারি। ভয় কি বাবা! আমরা কাঁধে ক'রে তোমায় নিয়ে যাব।

[মণীন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া স্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের শয়ন-কক্ষ;—হেমচন্দ্র ও অন্নপূর্ণা।

অন্ন। আমি যা' বলি তা' শোন; মেয়ে-মানুষ বলে অগ্রাহ্য কোরো না। মিছি মিছি ব'সে ভাবলে কি হবে? তা'তে মন খারাপ, আর শরীর মাটী হবে বই ত নয়? আমার গয়নাগুলো নাও, একটা সেক্‌রা ভাকিয়ে সে-গুলো বিক্রি ক'রে দাও। সেই টাকাতে একটা ব্যাবসা ট্যাবসা চালাও। তাতে সংসারও চল্‌বে, মনও বেশ ভাল থাকবে।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা তোমার গায়ের গয়না নিয়ে ব্যাবসা ক'র্ব্বো।

অন্ন। তাতে তোমার কি হ'য়েছে? গয়না কিসের জন্যে? টাকা লোকের হাতে থাকে না, খরচ হ'য়ে যায়। সময়-অসময়ে দরকার হবে ব'লেই লোকে গয়না গড়িয়ে রাখে। নইলে গয়না কি কেবলই প'রে সেজেগুজে বেড়াবার জন্যে? তা কখন নয়।

(আলমারি হইতে গহনার বাক্স বাহির করিয়া)

এই নাও। বাইরে গিয়ে একজন সেক্‌রা ডাকিয়ে, এগুলো এখুনি বিক্রি করিয়ে দাও! সেই টাকা ব্যবসাতে ফেল। বিপদের সময় কাতর হওয়া পুরুষ মানুষের উচিত নয়।

হেম। (অন্নপূর্ণার হস্ত হইতে বাক্স গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে রাখিলেন।) আবার কি ব্যবসা কোর্ব্বো? যে ব্যবসা ছিল, তাত গেল!

অন্ন। যে-ব্যবসা তোমার ছিল সেই ব্যবসাই চালাও, নয় ত' যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই কর! ব্যাবসা ট্যাবসার কথা আমি মেয়ে-মানুষ, কি বুঝ্‌ব? সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয়, তাই কর। সর্ব্বেশ্বর খুব বুদ্ধিমান্ লোক। আর একটা কথা—(ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)।

হেম। বল, কি কথা?

অন্ন। অত লোক-জনের দরকার কি? যখন যেমন তখন তেমন ক'র্ত্তে হয়। লোক-জন সব ছাড়িয়ে দাও। নিতান্ত যা না হ'লে নয়, তাই দু'-একজন রাখ। কাজ তুমি নিজে দেখ। তুমি দেখ্‌লে, নিজের কাজ নিজে কর্ত্তে পার্লে, একা পাঁচজন লোকের কাজ ক'র্ব্বে। তোমার একটু কষ্ট হবে, তা কি হবে? সময়ের মত ত চল্‌তে হবে?

হেম। আচ্ছা, যা বল্‌ছ, তাই কোর্ব্বো! তোমার মতন স্ত্রী যার সহায়, তার ভাবনা কি? আর ভাব্‌বো না! এইবার মন্ত্রীর পরামর্শ নিয়েই সব কাজ কোর্ব্বো! কেমন?

অন্ন। অত ঠাট্টা কেন?

হেম। ঠাট্টা করি নি, সত্যি বল্‌ছি! এইবার থেকে সব কাজ তোমার মত নিয়ে কোর্ব্বো! দেখি ঈশ্বর কি করেন্।

অন্ন। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদেরও এখন জবাব দিয়ে দিই। ভগবান্ যদি দিন দেন, তখন আবার রাখা যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত (হিন্দুস্থানী সুর)—আড়াঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্রপরে চারি ধারে সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তলপাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

কথা ও সুর—কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২ ৩
II সা ঋা -া মা । -া -া মা মা । দা -া -া -পদা।
দি বা • হ • • লো অ ব • • ••

• ১ ২
| -পদা -দা পা -া I গা মা -া -গা। মা দা -া পা |
•• • সা ন ডু বি • • হে মি • হি

৩ • ১
| -া মা -গমা -পমা। -গঋা -সা -ঋসা গা I পা দা সা -া |
• • •• •• •• • •• র যা মি নী •

২ ৩ •
| -া র্সা না র্সনা। -দা -পদা পদা পা। -া -া -া -া I
• আ নি তে• • •• খী• রে • • • •

১ ২ ৩
I গা মা -া -গা। মা দা -া পা) -া -মা -গমা -পমা |
চ লে • • ছে স • মী • • •• ••

| -গঋা -সা -ঋসা গা I
•• • •• র

I পা পা -দপা -মা। পা দা দা র্সা । -া -নর্সা -ঋর্সা র্সা |
মে ঘে •• • র ব র ণ • •• •• ঞ্জ
প ত্র •• • প রে চা ন্নি • •• •• ঘা
এ সো •• • কে দে থি তে • •• •• যা

| র্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা ঋা -া -সর্ঋা |
ল • • • সা গ রে তে শ ত • ••
রে • • • স খী গ ণ নৃ ত্য • ••
বে • • • এ মা য়া ফু রা য়ে • ••

| -জ্ঞর্ঋা -সা না র্সনা । -দা -পদা -পদা -পা I পা দা র্সা -া |
•• • ই ল• • •• •• • এ কি কা •
•• • ক রে• • •• •• • ক র্ত্তা •
•• • যা বে• • •• •• • এ খ নি •

| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা -নদা দা । পা -া -া -া ।
• মি নী • র • •• •• ছ ল • • •
• লি দি • য়ে • •• •• ক রে • • •
• ভা হ • ভু • •• •• বি বে • •• •

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা ।
গ্রা সে • • ক রি • ব • • •• ••
উ ড়া • • ম ন • মু • • •• ••
আ সি • • বে তি • মি • • •• ••

| -গঋা -সা -ঋসা ণা I
•• • •• র
•• • •• র
•• • •• র •

I সা সা সা সা । সা ঋা -া -া । -া -া -সঋা -ঙ্ঋা ।
ছ ড়া য়ে কু ন্ত ল • • • • •• ••

| ঋা সা -া -া I সা ঋা মা মা । মা মা -া -া ।
পা শ • • অ ধ রে ম ধু র • •

| -া -গমা -পমা -মা । গমা পমগা -ঋা -সা I পা দা র্সা র্সা ।
• • •• •• • হা • ••স • • প ব নে উ

| র্সা র্সা -া -া । -না -সনা -দা -পদা । ণদা দা -পা -া I
ড়া র • • • •• • •• বা • স • •

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা ।
ভু লা • • তে অ • ম • • •• ••

| -গঋা -সা -ঋসা ণা I পা দা র্সা -া । -া র্সা না র্সনা ।
•• • •• র যা মি নী • • আ নি তে•

| -দা -পদা ণদা পা । -া -া -া -া I গা মা -া -গা ।
• •• বী • রে • • • • চ লে • •

¦ মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা । -গঋা -সা -ঋসা ণা I I
ছে স • মী • • •• •• •• • •• র

সদাচার।

ন্যায়বান্ নরপতির সাম্রাজ্যশাসনের বিধি-সমূহ যদ্রূপ মানবকে দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, সদাচারও তদ্রূপ মানবকে স্বার্থান্বেষণপর অবিমৃষ্যকারী স্বল্পদৃক্ ব্যক্তিগণের অশিষ্টতা ও রূক্ষতার কবল হইতে পরিত্রাণ দিয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের সদাচারপদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক এবং সে উদ্দেশ্য সমাজে পরস্পর-সংঘর্ষ-নিবারণ এবং দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধন। কারণ, পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সদাচারে এবং দয়ার কার্য্যে কোনও পার্থক্য নাই। বাস্তবিক, সদাচার বা সদ্ব্যবহারের মূলে নিঃস্বার্থতা, উদারতা,—আপনার অপেক্ষা প্রতিবেশী জনেই সমধিক প্রীতি এবং মহাজন-প্রদর্শিত উন্নত আদর্শ স্বকীয় জীবনে প্রকটিত করিবার জন্য নরনারীর ঐকান্তিকী বাসনা।

সুতরাং স্থলবিশেষে কখনও যদি আবশ্যক প্রকৃত সদাচার-বিষয়ে মানব অজ্ঞ বা সন্দিহান হয়, তাহা হইলে তখন তাহার অন্তঃকরণে কেবলমাত্র এই প্রশ্ন উদিত হওয়া উচিত যে, সেস্থলে নিঃস্বার্থ ও বিবেচনাপূর্ণ কর্ত্তব্য কি? এবং তাহা হইলে সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্পই থাকে। প্রকৃতির ক্রোড়পালিত নরনারীর মধ্যে আমরা প্রায়শঃই এই তথ্যের যাথার্থ্য অবলোকন করিয়া থাকি। সামাজিক-শিক্ষা লাভ না করিয়াও তাহারা তাহাদিগের নিঃস্বার্থপরতা এবং পরানুভূতিতে সবাই সমাদরশীলতা প্রভৃতির গুণে স্বভাবতই কেমন উদার ও অমায়িক।

সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সদাচার-দ্বারা প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যই সকলের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ। এবং সম্ভ্রান্তবংশজাত ব্যক্তি, দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনকালে সম্যক্ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, উন্নত সভ্য সমাজের সাধারণ রীতিনীতিগুলি শিক্ষা করিতে ঘৃণাবোধ করে না। কারণ, যদিও এ-সকল বিষয়ে অজ্ঞতা কোনও লজ্জার বিষয় নহে, কিন্তু তথাপি অতীব সহজলভ্য জ্ঞানার্জ্জনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা মূর্খতামাত্র। এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জ্ঞানের সহিত মানুষ যদি নিঃস্বার্থ স্বভাবের অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সমাজিক ব্যবহারে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোনও বক্তাকে—তিনি তাঁহার বাক্যদ্বারা শ্রোতার চিত্তহরণে যতই অসমর্থ হউন্ না কেন,—বাধা প্রদান করা সদাচার-বিরুদ্ধ। কারণ এই কার্য্যদ্বারা বক্তার বাক্য অপেক্ষা আপনার বাক্যের অধিতর গুরুত্ব ও সারবত্তা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং, ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত শ্রোতা হওয়া সদাচার-সঙ্গত।

অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সদাচার-পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ সামাজিক আচার-ব্যবহারকে এক প্রাণহীন বৈচিত্র্যহীন একরূপতায় পরিণত করে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তেই দেখা যাইতে পারে যে, নীরস বক্তাকে সদাচারানুরোধে যদি সংযত না করা হয়, শ্রোতৃবর্গের অন্যমনা হইবার

যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং প্রকৃষ্ট বাগ্মিবরের পক্ষে শ্রোতা ও তাঁহাদিগের ধৈর্য্যলাভ দুষ্কর হইয়া পড়ে। কেহ কেহ পুনরায় সদাচারের কৃত্রিমতা-বিষয়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন্। যিনি আপনাকে বাক্যমনে একরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন্, সেই সরলতাভিমানী ব্যক্তির নির্ব্বন্ধ—"সহজ হও, কৃত্রিমতা পরিত্যাগ কর।" কিন্তু এই সকল প্রকৃত বিপৎসমূহ সত্ত্বেও জগতের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কেবলমাত্র কৃত্রিমতাবর্জ্জনই, সহজ হওয়াই সমাজের রীতি হয়, অন্য কোনও লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক জীবন অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব স্বভাবতঃই পরস্পর-সংগ্রাম-প্রিয়, বিরোধাভিলাষী জীব এবং এস্থানে এই সদাচাররূপ সমাধান না থাকিলে সমাজের অস্তিত্বও বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত—

হিয়ার বনে তোমার বেণু।

আমার হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে;
তব অভিসারের ভূষণ লয়ে'
অবশ তনু সেজেছে!
কুঞ্জ-দ্বারে মানস-ভ্রমর
গুঞ্জরি কয় তোমার খবর,
শুনে' বসন্ত-গান, প্রাণের বাগান
ফুলের হাসি হেসেছে;
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে!

জেগে দেখি তোমার হাওয়া
উড়িয়ে নেছে সকল চাওয়া,
আমার সকল অণু শুনিয়ে বেণু
অরুণ-রাঙায় রেঙেছে!
যা' আছে মোর ধর ধর,
পরশ দিয়ে সরস কর,
ওগো এতদিনে সহজ ধরম
সরম-বেড়ি ভেঙেছে!
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে! *

নরবেশ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পশুচিকিৎসা।

পশুদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে পীড়িত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা সুস্থ পশুগুলিও রোগাক্রান্ত হইবে। শুশ্রূষাকারিগণ সর্ব্বদা রোগনাশক পদার্থের দ্বারা হস্তপদ ধৌত করিবে। পীড়িত পশুদিগের গৃহে চূণ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

স্তন-স্ফীতি :—গাভী ও মহিষের স্তন-

* রবীন্দ্রনাথের "আমল আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না" সুর।

গ্রন্থির স্ফীতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায়। শরীরের উষ্ণাবস্থায় শৈত্যের আক্রমণ, খারাপ দোহন, দোহনের পূর্ব্বে বহুক্ষণ ধরিয়া স্তনে দুগ্ধের অবস্থিতি, গোয়ালঘরের পাকা মেজ, দোহনকালে বাঁটে খামচি কাটা, দুগ্ধ নিঃসৃতিতে বাধা, বাঁট ধৌত করণান্তর তাহাকে আর্দ্র রাখা প্রভৃতি কারণে উক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এই রোগটী প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ নিচয় ঘটিয়া থাকে :—গ্রন্থির স্ফীতি, স্পর্শে যন্ত্রণা, চর্ম্ম লাল এবং গাভীর পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ খঞ্জ হয়। দুগ্ধ কমিয়া যায়, জাল দিলে দুগ্ধ ফাটিয়া যায় এবং দুগ্ধের সহিত রক্ত প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। পূঁজ জন্মিলে বাঁট নরম হয়। নবপ্রসূতা গাভীর বাঁট প্রায়ই ফুলিয়া থাকে। সামান্য ফোমেণ্ট করিলেই তাহা আরোগ্য হয়। উষ্ণ রেড়ীর তৈল দিয়া বাঁটটী দিনে তিনবার ডলিয়া দিবে। ধূম লাগাইলেও উপকার দর্শে। এরূপ অবস্থায় জুলাপ দেওয়া উচিত। সেড় সের ঘৃত খাওয়াইলেই জুলাপের কার্য্য করিবে। এই জুলাপের সহিত দুই সের পুরাতন গুড় ও এক সের কাল জিরে পূর্ণবয়স্ক গাভীকে তিন দিন খাওয়াইবে। ম্যাগ্‌নেসিয়া গাভীকে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধ অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। জলের সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। সময়ে সময়ে দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিয়া দিবে অথবা বাছুরের দ্বারা দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিবে। উত্তমরূপে ফোমেণ্ট করিয়া বেলে-ডোনার পুলটিস্ সমস্ত গ্রন্থিতে লাগাইয়া একটা ব্যাণ্ডেজ কোমর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিবে। কখনও ফোড়া আপনিই ফাটিয়া যায়, কিন্তু অস্ত্রোপচার-দ্বারা যন্ত্রণার আশু লাঘব হয়। ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক অথবা যোমের মলম লাগাইবে। যদি রোগ সময়ে ধরা যায় ও ফোমেণ্ট করা যায়, তবে তাহা কঠিন হইতে পায় না। এমন কি আরোগ্য হইয়া যায়।

মহিষের বাঁটে প্রায়ই একটা গোল পদার্থ জন্মিয়া দুগ্ধ-নির্গমনে প্রতিবন্ধকতা করে। বাঁটে হস্ত প্রদান করিলেই সেই গোল পদার্থের অনুভব করিতে পারা যায়। যে-সকল গাভী বা মহিষের বাঁটে গোল পদার্থ থাকে, সে-সকল গাভী বা মহিষ কখনও ক্রয় করিবে না।

বাঁটে ক্ষত :—বাঁটে ঘা অনেক কারণে হইয়া থাকে। গাভীর গৃহের মেজেতে চূণ দিলে বাঁটে ফুস্‌ফুড়ি জন্মে ও পরে তাহা ঘায়ে পরিণত হয়। বাঁটের নব দুগ্ধ যদি মুছাইয়া না দেওয়া হয়, তবে গাভীর বাঁটে ঘা জন্মে; বাঁট দিয়া রক্তও বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় একটা তাওয়া খুব গরম করিয়া তাহার উপর দুগ্ধ দোহন করিবে, অবশ্য উষ্ণ তাওয়াটী বাঁটের খুব সন্নিকটে ধরা চাই। এতদ্দ্বারা ধূমটী বাঁটে লাগিবে; সুতরাং রোগেরও উপকার দর্শিবে। যে-সকল স্থলে গাভীর বাঁট আক্রান্ত হয়, সে-সকল স্থলে জুলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। জুলাপের উপকরণ—১ সের ১ পোয়া ঘৃত এবং চার আউন্স (২ ছটাক) কাল জিরা। স্তন ও বাঁটে উষ্ণ রেড়ীর তৈল প্রত্যহ কয়েকবার লাগাইবে এবং জলে নিম-পাতা সিদ্ধ করিয়া ফোমেণ্ট করিবে। বাছুর বাঁট কামড়াইলেও বাঁটে ঘা জন্মে।

আব :—বাছুরের আব প্রায়ই দেখা

যায়। তাহারা স্বতঃই সময়ে অন্তর্হিত হয়। যদি আবে পূজ জন্মে, তবে অস্ত্রোপচার করাই উচিত। পূজ বাহির করিয়া দিয়া ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক বা মোমের মলম দেওয়া উচিত। মোমের মলমের উপাদান :— মোম, নারিকেল তৈল, ভেসেলিন এবং সামান্য তুঁতে। বৃদ্ধ পশুতে অস্ত্রোপচারই আরামপ্রদ। পূজ ইত্যাদি মুছাইয়া দিবে। কিন্তু বাছুরে আব স্বতঃই লোপ পাইতে দিবে।

পশুর ক্ষত যদি সাবধানতাপূর্ব্বক ধৌত করা হয় ও বিষ-বিনষ্টকারী ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তবে শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়। যদি রক্ত পড়ে, তবে তাহাকে প্রথমে রোধ করিতে হইবে। দোষ-বিনষ্টকারী ঔষধের মধ্যে কখনও ফেনাইল ব্যবহার করা হয়। এতদ্দ্বারা মক্ষিকাও থাকে না। কিন্তু নিমতৈল-দ্বারা শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এবং জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া দিলে, ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। শরীরের ও স্তনের সকলপ্রকার ক্ষত নিমজল-দ্বারা দুই বা তিনবার ধৌত করিবে এবং মোমের মলম ব্যবহার করিবে।

দাদ :—বাছুরেরা প্রায়ই দাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্পর্শা-ক্রামক রোগ। ইহার প্রতিকার না করিলে ইহা কষ্টের নিদান হইয়া পড়ে। ঔষধ করিতে হইলে গাত্রের দাদগুলি হইতে মামড়ি উঠাইয়া দিতে হইবে ও পরে তাহাতে nitrate of mercury ointment, nitrate of silver, এবং জল-মিশ্রিত sulphuric acidএর দ্বারা ধৌত করিবে। তার্পিন তৈল ও তুঁতে তিনবার করিয়া লাগান উচিত। দাদের দ্বারা আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্য পশু হইতে অন্যত্র রাখিয়া দিবে।

Mange—Mange-নামক রোগ মহিষ-শিশুরই হইয়া থাকে। ছয় সপ্তাহ হইতে ৬ মাসের বাচ্ছা পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়। বড় বড় মহিষের যে এ রোগ হয় না, তাহা নহে। মাতার দুগ্ধেই উক্ত রোগের বীজ নিহিত থাকে। এই রোগাক্রান্ত বাছুরকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার গাত্র কাঁচা-মাংসের ঢিবিমাত্র। এই রোগ হইলে বৎসগুলিকে অন্যত্র রাখাই বিধি এবং তাহা-দিগকে দেখিবার জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করা উচিত। বাছুরগুলিকে দেশীয় সাবান-দ্বারা ধৌত করিবে ও তার্পিণ তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং গন্ধক ও তুঁতে রোগাক্রান্ত স্থানে দিনে একবার করিয়া লাগাইবে। কেহ কেহ ফেনাইল ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্তই অধিক ফলপ্রদ।

বসন্ত :—বসন্ত হইলে গাভীর শরীরের কোন কোন স্থান লাল হইয়া উঠে এবং পরে স্তন ও বাঁটে চাকা চাকা দাগ হয়। রক্তবর্ণ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন দানা বাহির হয়। আট বা দশ দিন পরে দানাগুলি ফুটিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। দানা না ফুটীয়াও শুষ্ক হইয়া যায়। রোগের প্রাবল্য দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। এই রোগে গাভীর অত্যন্ত জ্বর হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং উদরাময় সঙ্ঘটিত হয়। এই রোগে জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের উপকরণ ম্যাগ্‌নেসিয়া। পূর্ণবয়স্ক

গাভীর জন্য ইহা ২ পাউণ্ড (১৬ ছটাক) প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত বিরেচক আহারও দিতে হইবে। দুগ্ধ যেন সাবধানতার সহিত পূর্ণমাত্রায় বাহির করা হয়। বসন্ত রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ যেন কেহ ভুলক্রমেও আহার না করে।

উকুন:—মহিষের গাত্রে বড়ই উকুন হইয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায় এবং বাছুরের শারীরিক উন্নতি হয় না। এই রোগ হইলে লোমগুলি কর্ত্তন করিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে। তামাকের জল দ্বারা গাত্র-ধৌতি এবং তামাকের গুঁড়ার দ্বারা সমগ্র গাত্র ঘর্ষণ করিয়া দিবে। শীতকালেই এই রোগ প্রবল হয়। কেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লাগাইলে উকুন মরিয়া যায়। ফেনাইলে জল মিশ্রিত করিতে হইলে, জলের মাত্রা অধিক হওয়া চাই, নতুবা মহিষের গাত্রে ফোস্কা পড়িতে পারে। কেরোসিন তৈল দ্বারাও উকুন মরে বটে, কিন্তু তাহা সাবধান হইয়া লাগান উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নিরাশ।

ব্যথা পায় নিতি সেই ভালবাসে যেই;
যে-জন বাসে নি ভাল তার সুখ কই?

সব চেয়ে ব্যথা দেয় সেই ভালবাসা,
ভাল বেসে অবশেষে করে যে নিরাশা।

শ্রীঅমল দত্ত।

অভাগিনী।

পাটনা সহর। ক্ষুদ্র বাংলা সহরের একটু দূরে। তখন বেলা দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে; রাস্তায় লোক-চলাচল একেবারে নাই বলিলেই হয়। কচিৎ ২।১ জন মুটে-মজুর বা পথিক শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। বাংলাটী বেশ ছোট-খাট। তাহার সাম্‌নে একটু ফুলের বাগান। বাগানে কয়েকটা গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাস্তার উপরেই বাংলাটী। রাস্তার ধারের জানালায় একটী ১৮।১৯ বৎসরের সুন্দরী রমণী নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি রাস্তা ছাড়িয়া আরও দূরে নিবদ্ধ। কোনও বস্তু যে সে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে, তাহা নহে। তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন সে গভীরভাবে কাহারও চিন্তা করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া তাহার দৃষ্টিরোধ করিতেছে কিন্তু চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সে চক্ষু মুছিয়া ফেলিতেছে। হঠাৎ গানের শব্দ শুনিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল ৮ হইতে ১০ বৎসরের ৮।১০টী বালিকা গাহিতে গাহিতে যাইতেছে;—

"ও মা, কেমন মা তা কে জানে!
মা বলে মা ডাকৃছি কত,
বাজে না কি মা তোর প্রাণে!"

রমণীটীর নাম শান্তি। একমনে গান শুনিতে শুনিতে পশ্চাদ্‌গামী একটী গৌরবর্ণা বালিকাকে দেখিয়া শান্তি চমকাইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বালিকার দলও নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সেই হইতে শান্তি শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ বেলা একটা-দেড়টার সময় জানালাটীর নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়?—শুধু সেই গৌরবর্ণা বালিকাকে এক মুহূর্ত্তের দেখা দেখিবার জন্য। মুহূর্ত্তের দেখা!—সে চলিয়া গেলেই একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তি কর্ম্মান্তরে চলিয়া যাইত। দৈনিক জীবনে ইহাই তাহার একটী প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। সেই সময়ের জন্য সে এতই অন্যমনা হইত যে, তাহার আর বালিকাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা কহা ঘটিয়া উঠিত না।

(২)

"শান্তি, শান্তি"—বিমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল। স্বামীর আহ্বান শুনিয়া শান্তি জানালার নিকট হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ স্বামীর শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য সে বিস্মিত হইল। সে এতক্ষণ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এজন্য স্বামীর আগমন সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে যথাসাধ্য মুখ ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুখ দেখিয়া বিমল সকলই বুঝিল; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শান্তি, এখনও আমি চলে গেলে একলা বসে কাঁদ? যে চলে গেছে, সে কি আর ফিরে আসবে? তবে কেন কাঁদ?" শান্তি স্বামীর পদতলে পড়িয়া কহিল, "না গো, না, সে আমাদের আজ প্রায় একবৎসর ছেড়ে গেছে। আজ কতদিন তার জন্যে কাঁদি নি। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর বিধাতা আমার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়ে কেন আবার—আবার তা'র স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন? একেবারে যে তার মত দেখ্‌তে!"

বিমল সাদরে তাহাকে তুলিয়া বলিল, "কার মত দেখ্‌তে? খোকার মত দেখ্‌তে? কে দেখ্‌তে?—কা'কে তুমি দেখেছ?"

শান্তি তখন সেই বালিকাটীর কথা বলিয়া বলিল, "একেবারে আমার বিনয়ের মত দেখ্‌তে! সেই নাক, সেই মুখ, সেই রং; যেন আমার সে আবার মেয়ে হয়ে—!"

বিমল তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "পাগল আর কি? কা'দের মেয়ে, না কাদের মেয়ে যাচ্ছে! যাক্, বড় ক্ষিদে পেয়েছে! আপাততঃ কিছু খেতে পাব কি?"

শান্তি ব্যস্ত হইয়া জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল। বিমলও ২।৩ দিন পূর্ব্বে রাস্তায় সেই বালিকাকে দেখিয়াছিল; দেখিয়া তাহারও মন বিষণ্ণ ছিল। কিন্তু সে শান্তিকে ইহার কিছুই বলে নাই। কারণ, সন্তানহারা জননীর শোক ঘনীভূত করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

বিমলকুমার রায় আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল পাটনায় মুন্সেফি করিতেছে; পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের মুন্সেফ ছিল। সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ও একটী পুত্র,—বিনয়কুমার। আজ দশমাস হইল সোনার সংসার অন্ধকার করিয়া দিয়া তিনবৎসরে বিনয়কুমার মায়ের কোল

শূন্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। শান্তি বিমলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা পত্নীর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিত্রালয়ে হঠাৎ মৃত্যু হয়, ইহাই বিমল জানেন্। সে আজ প্রায় ৮ বৎসরের কথা। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরবৎসরেই বিমলের শান্তির সহিত বিবাহ হয়। শান্তির বয়স তখন দশবৎসর ও বিমলের বয়স ২৪ বৎসর। শান্তি দেখিতে সুন্দরী; বিমলও গৌরবর্ণ সুন্দর যুবক। বিনয়-কুমার পিতার ন্যায় দেখিতে হইয়াছিল। শান্তি পুত্রের মৃত্যুর পর বড়ই কান্নাকাটী করিত। কয়েক দিন সে দেখিল, সে কাঁদিলে স্বামীর মুখ ম্লান হইয়া যায়, স্বামী অসুখী হন্; ঘরে শ্বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই হইতে সে মনের দারুণ ব্যথা মনেই চাপিয়া সংসারের কাজ করিয়া যায়। স্বামীর মুখ পুনরায় অম্লান হাসিতে হাসিয়া উঠিল। আজ কয়েকদিন হইতে হঠাৎ পুত্রের মুখের সহিত সেই গৌরবর্ণা বালিকার সাদৃশ্য দেখিয়া শান্তির পুত্রশোক জাগিয়া উঠিল।

(৩)

আজ দুইদিন হইল শান্তি সমস্ত দুপুর খরিয়া জানালায় দাঁড়াইয়াও বালিকার সাক্ষাৎকার পাইল না। মনটা তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গিনীরা চলিয়া যায়, কৈ সেই মেয়েটী ত তাহাদের মধ্যে নাই? কি হইল তাহার? দুই দিন পরে আজ শান্তি আর থাকিতে না পারিয়া সেই বালিকাদিগকে নিকটে ডাকাইল। মেয়েটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, সে তাহাদের সঙ্গিনী নহে; সে ভদ্র গৃহস্থের কন্যা। তাহার মাতা বর্দ্ধমান; তিনি কাহারও সঙ্গে বড় একটা মেশেন্ না। মেয়েটীর নাম বিজয়া। কয়েক দিন বিজয়া কেবলমাত্র সখ করিয়াই তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। বিজয়ার দুইদিন ধরিয়া সামান্য জ্বর হইয়াছে। শান্তি সেই মেয়েটীর বাটী কোথায়, তাহার কে কে আছেন, ইত্যাদি সমস্ত জানিয়া লইয়া বালিকা-দিগকে বিদায় দিল। সেইদিন রাত্রেই এক ঝিকে লইয়া শান্তি বিজয়াকে দেখিতে গেল। বিমলও ইহাতে তাহাকে বাধা দিল না। কারণ, শান্তি যাহাতে মনে শান্তি পায়, সে সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করে।

শান্তি বিজয়ার মাতাকে দেখিল। শ্যামবর্ণা করুণাময়ী মূর্ত্তি। তাঁহার নাম কমলা। বয়স তেইশ বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। ঝির নিকট হইতে শান্তির পরিচয় পাইয়া বিজয়ার মাতা চমকাইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনিমেষনেত্রে তাকাইয়া রহিল। শান্তিকে নিজের বিস্ময়ভাব বুঝিতে না দিয়া কমলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বসাইল; খুব আদর-যত্ন করিল, ঘর-সংসারের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। শান্তিও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তাহাকে নিজের প্রাণের ব্যথা, পুত্রশোকের কথা প্রভৃতি শুনাইল। শান্তি বলিল, "দিদি! আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম; না, না, ভুলি নি। সে কি ভুলিবার জিনিষ! স্বামীর সুখের জন্যে, তাঁর প্রীতির জন্যে তা'র শোককে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দিদি! যে-দিন থেকে বিজয়াকে দেখ্‌লাম, সে-দিন থেকেই তা'র শোক আবার নূতন করে জেগে উঠ্‌ল। বিজয়া যে একেবারে তারই মত দেখ্‌তে! বিজয়া পরের মেয়ে, তাকে ত

আর রাত দিন নিজের কাছে বুকে করে রাখ্‌তে পারি না?" বলিতে বলিতে শান্তি আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। কমলার চক্ষুও শুষ্ক থাকিল না। সে শান্তিকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া, কমলা একটীমাত্র ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তিকে কন্যার বিছানার পার্শ্বে লইয়া গেল এবং বলিল, "শান্তি! আমার বিজয়া সম্ভ্রান্তজাতা কায়স্থকন্যা। তা'র পিতা বর্ত্তমান। তিনি শিক্ষিত, বিনয়ী, ধনী; কিন্তু বিজয়া তা'র দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার স্নেহে বঞ্চিত। পিতার মর্ম্ম সে কিছুই বুঝে নি। সে শুধু তার অভাগিনী মাকেই জানে। আমিও কপালক্রমে স্বামী হতে বঞ্চিতা। তিনি পুনরায় একটী সতীলক্ষ্মী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া সুখে আছেন্। আমার পিতাও প্রচুর অর্থের অধিকারী। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা। আমার একটী ভ্রাতাও আছেন্। মৃত্যুসময়ে পিতা তাঁর অগাধ সম্পত্তি আমাদের দুই ভাই-বোনকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তবে মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে গিয়েছেন যে, বিজয়াকে গৌরীদান কর্‌তে হবে। বিজয়াও সম্প্রতি আট বছরে পড়েছে। এই বছরেই তা'র বিবাহ দিতে হবে।" এই বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া কমলার চক্ষু-দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে শান্তির ডান হাতখানি টানিয়া লইয়া বিজয়ার ডানহাত তাহার উপর রাখিয়া বলিল, "শান্তি, আজ হতে আমি তোমার হাতে আমার বিজয়াকে দিলাম। আজ হতে তুমি তা'র মা হলে। সে তোমারই কন্যা। তা'র বিবাহও তুমি দিবে। তোমার স্বামীর মতামত কি, জানি না; কিন্তু মনে হয়, তিনি তোমার কথায় আপত্তি কর্‌বেন না। তুমি তা'কে তোমার ঘরে রাখ্‌তে চাইবে জানি, কিন্তু আমি কিরূপে তা'কে ছেড়ে থাক্‌ব? না, না, তোমার হাতে বিজয়াকে সমর্পণ করেছি, তুমিই নিয়ে যেও। বিজয়া! মা, আমার বুকের ধন, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি; আমি তোমার হতভাগিনী জননী! আমাকে ভিন্ন তুমি কা'কেও জান না। কিন্তু মা, আজ তোমার আর এক মা হ'ল। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুমি পিতৃস্নেহ কখনও পাও নি; ভগবানের আশীর্ব্বাদে পিতার আদরে তুমি আদরিণী হবে! তবে যাই। যাও মা, তোমার পিতা ও নূতন মা'র নিকট যাও; কোনও দুঃখ পাবে না, আশীর্ব্বাদ করি।"

শান্তি নিজকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আয়তনেত্রে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলার অশ্রুপ্লাবিত, বেদনাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন বুঝিল যে, তাহার কথা সত্য, সে ঠাট্টা করিতেছে না, শান্তির হৃদয়-মন বিস্ময় ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে আকুলভাবে কমলার পা-দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; রুদ্ধস্বরে বলিল, "দিদি, দিদি, কে আমি যে, আমার জন্যে তুমি এত দয়া দেখাচ্ছ? দিদি, তুমি কি দেবী, দিদি? আমি পুত্রহারা জননী; জানি না, কি পাপে আমাদের এ শাস্তি! তোমার এত দয়ার যোগ্য কি আমরা!"

কমলা তাহাকে নীরবে পদতল হইতে উঠাইল; মনে মনে বলিল, 'কেন আমি আমার হৃদয়ের মাণিককে, চোখের তারাকে আজ বুক খালি করে তোমাদের দিলাম, তা'র তুমি কি বুঝ্‌বে, শান্তি? আজ কিরূপে আত্মবলিদান কর্‌লাম, তার মর্ম্ম তোমার উপলব্ধি করা সুদুরাহত। তুমি আমার কে? জান না? উঃ! কা'কে কি বল্‌ছি! ভগবান! এতদিন যখন সহ্য করে এসেছি, জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্য বল দাও, শান্তি দাও, আর দাও সহ্য কর্‌বার শক্তি।"

* * *

বিজয়া এখন শান্তির নিকটেই থাকে। তাহাকে আনয়ন করাতে বিমল কিছুমাত্র দুঃখিত নয়; বরং আনন্দিত। শান্তির নিকট কমলার যে পরিচয় শুনিয়াছিল, তাহা সে অবিশ্বাস করে নাই। তাহার মনে কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল যে, কমলা তাহার জীবনের সমস্ত কাহিনী বলে নাই; গোপন করিয়া গিয়াছে। তবে সে কমলার এই স্বর্গীয় ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তাহাদের জন্য তাহার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি? তাহার সার্থকতাই বা কি? পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, ধনিকন্যা, সন্তানবতী জননীর, তাহার ও শান্তির জন্য কেন এ অনুগ্রহ—কেন এ অসামান্য দান? কমলার সহিত চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, তাহাকে দেবী মনে করিয়া সে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বুঝিল না বিমল, কমলার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি?

(৪)

প্রভাতের মৃদু মন্দ শীতল বায়ুর সহিত সানাইয়ের করুণধ্বনি মিশিয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পাটনাসহর তখনও জাগিয়া উঠে নাই। শুধু বিবাহবাড়ী আজ আনন্দ কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে। আজ বিজয়ার বিবাহ; শান্তির গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। কমলা বিবাহ-বাটীতে আসে নাই। শান্তির শত ক্রন্দন, অনুযোগ-অনুরোধেও সে আসিতে স্বীকৃত হয় নাই।—কেন তাহা কমলাই জানে। সে শান্তিকে শুধু বলিয়াছিল যে, বিজয়ার বিবাহের পর সে যেন একবার কন্যা ও জামাতাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। শান্তি ও বিমল কমলার এ ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইল। কিরূপ মা যে সন্তানের শুভপরিণয়ে উপস্থিত থাকিতে চাহে না?

এক সুশিক্ষিত সুপাত্রের সহিত বিজয়ার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। কমলার পিতার ইচ্ছানুসারে তাহাকে গৌরীদান করা হইয়াছিল। কন্যা-জামাতাকে লইয়া শান্তি বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে কমলার নিকট গেল। কমলা তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বিজয়া সেইদিন বৈকালেই শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তিনটী হৃদয় তিন জনের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িল। বিজয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কিতে উঠিল। শান্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বিদায় দিল। আর কমলা বিজয়া-বিদায়ের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শয়নগৃহে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ কমলার সব শেষ হইয়া গেল!—স্বামী অনেক দিন তাহাকে পরি-

ত্যাগ করিয়াছেন, মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কন্যা বিজয়াও আজ পর হইয়া গেল!

বিজয়ার শ্বশুরালয়-গমনের দুইদিন পরে শান্তি কমলার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেল। সে গিয়া দেখিল বাটী শূন্য; কমলা সে গৃহে নাই। পার্শ্বের বাড়ী হইতে জানিল, গত রাত্রিতে কমলা দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে তাহা তাহাদিগকে বলিয়া যায় নাই। কমলার সহসা এরূপভাবে তাহাদিগকে কোনও খবর না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে শান্তি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিল এবং বিমলকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। বিমলও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কমলার দাসী আসিয়া শান্তির হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "কাল যাবার সময় মা-ঠাকুরুন্ আমার হাতে এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে বলে গেছেন।" শান্তি চিঠিখানি লইয়া নিজ শয়নগৃহে অতিক্রত চলিয়া গেল; পত্র খুলিয়া দেখিল কমলা তাহাকেই পত্রখানি লিখিয়াছে। পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল! অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া আবার সে পড়িতে লাগিল—

"চিরায়ুষ্মতীষু,

স্নেহের শান্তি, আজ আমি তোমাদের কোনও সংবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, বোধ করি, তোমরা কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে; কিন্তু তোমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। আমার বিজয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার কথা বলিও। তাহার জন্যই আমি এ জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। তাহাকে তোমাদের হাতে দিয়া, আমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে সুখে থাকুক্ ও সকলকে সুখী করুক্, এই আমার কামনা। তোমরাও তাহাকে চিরদিন কন্যা-স্নেহে প্রতিপালন কর।

"আমার ব্যবহারে তোমরা যে আশ্চর্য্য বোধ করেছিলে, জননী হইয়া সন্তানের শুভকার্য্যে যোগদান করে না,—এই সবের কারণ ও আমার প্রকৃত পরিচয় আজ তোমাদের দিব। জানি না, শুনিয়া আমার উপর তোমার ও তোমার স্বামীর মনের অবস্থা কিরূপ হইবে। আমার পিতার নাম তোমার স্বামীর অজ্ঞাত নয়; সেইজন্যই তাঁহার নাম তোমার নিকট পূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় কাশীরাম মিত্র। আমার পিত্রালয় নদীয়া জেলায় রামপুর গ্রামে। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা দুই ভাই-বোন। শৈশবেই আমরা মাতৃহীন হই। শান্তি! আমার সুখের রশ্মি জীবনের প্রাতঃ-কাল হইতেই অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। বনিয়াদী ঘর ও বংশ দেখিয়া অনেকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কন্যা দেখিয়া কাহারও পছন্দ হয় না। কেন? কি দেখিয়া আমাকে পছন্দ হয় না? আমার গুণ কেহ দেখিল না, দেখিল শুধু বাহিরের রূপ। আমার সে চাকচিক্যময়, গৌরবর্ণ রং ছিল না, ছিল শুধু পিতার প্রচুর অর্থ ও আমার জীবনের প্রধান বৈরী শ্যামবর্ণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সংসারে কাহারও বিবাহ আটকায় না; আমারও বিবাহ হইয়া গেল। লিখিলাম বটে বিবাহ হইয়া গেল,

কিন্তু পরমসুন্দর স্বামীর মনোমত হইতে পারিলাম না। শ্বশুর প্রচুর অর্থলোভে তাঁহার পুত্রের জীবন অসুখী করিয়া তাঁহার গৃহে আমাকে স্থান দিলেন এগার বছরে আমার বিবাহ হয়। সেই বয়সে অনেক বালিকাই কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আমি তাঁহার মনের অশান্তির কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমার শ্বশুরের নাম, স্বামীর পরিচয় ও দেশের নাম কিছুই বলিব না। আমার যে পরিচয় দিলাম, তাহাতেই তোমার স্বামী আমাকে বিশেষ-রূপেই চিনিতে পারিবেন এবং তুমিও আমাকে বুঝিতে পারিবে। আমার সহিত অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সহিত তিনি কথাবার্ত্তা ও ঘরসংসার করিতেন। অভাগিনী আমি! তাঁহাকে তখন আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও মুক্তি দিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমার শ্বশুরঠাকুর। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহাদর করিতেন। সেই নিরাশামণ্ডিত অন্ধকারময় শ্বশুরালয়ে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল ও আকর্ষণের বস্তু তিনিই ছিলেন। তিনিও সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে কত তিরস্কার করিতেন, কিন্তু আমি ভাবিতাম, কেন তিনি এ চেষ্টা করিতেছেন? জোর করে কি ভালবাসা যায়? যদিও বুঝিতাম, তিনি আমার উপর স্নেহবশতঃ ঐরূপ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ চেষ্টায় আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতাম। অভাগিনীর এ সুখটুকুও, বুঝি, বিধাতার সহ্য হইল না। তিন দিনের জ্বরে আমার শ্বশুর আমাকে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলিয়া পর-লোকে চলিয়া গেলেন। আমার দুঃখ ষোলকলায় পূর্ণ হইল। শ্রাদ্ধশান্তি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার স্বামীর ভাবান্তর দেখিলাম। তিনি বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া বেড়ান; গৃহে খুব কমই থাকিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, তিনি পিতৃ-শোক-সংবরণের জন্য কিছুদিন ধরিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। শুনিয়া নীরবে রহিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় পুড়িয়া গেল; বুঝিলাম, কি জন্য এ গৃহত্যাগ; পিতার দোহাই কেন মিথ্যা দিলেন? এতদিনে যাহা করিতে পারি নাই, সে দিন তাহা করি-লাম। স্বামীর অনুমতি লইয়া চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলাম। শুনবে শান্তি, তখন আমার বয়স কত? পনের বৎসর বয়সে জীবনের সর্ব্বসুখে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনী হইলাম। আর বিশেষ কিছু বলিবার নেই। যখন পিত্রালয়ে আসিলাম, তখন বিজয়া অভাগিনীর গর্ভে। তিনি কিছুই জানেন না; আমিও স্বামি-গৃহত্যাগকালে বুঝিতে পারি নাই। বিজয়ার ভূমিষ্ঠ হইবার পর অর্থাৎ আটমাস পরে রটাইয়া দিলাম যে, অভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। পিতাকে অনেক কষ্টে এ সংবাদ রটাইতে সম্মত করাইয়াছিলাম। আমার স্বামী এ মৃত্যুসংবাদে কিছু অবিশ্বাস করিলেন না, কোন খোঁজ-খবরও লইলেন না। বোধ হয়, মুক্তির ও তৃপ্তির একটা ক্ষুদ্রনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছিলেন। কন্যার জন্মের কথাও তাঁহাকে শুনান হয় নাই। কিছুদিন পরেই শুনিলাম যে, তিনি একটী পরমসুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘরসংসার করিতেছেন। আমিও আর তাঁর কোন খোঁজ লইতাম না, পাইতামও

না। শুনলে ত শান্তি, অভাগিনী, দুঃখিনী, পতিপরিত্যক্তার জীবনকাহিনী? চলিলাম;—কোথায় জানি না।—কোনও অনুসন্ধান কোরো না। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়, তুমি স্বামী-সোহাগে সোহাগিনী হয়ে চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থেক। বিদায় শান্তি!—

দুঃখিনী
কমলা"

সে-দিন বিমলের ছুটী ছিল। আহারের পর বিশ্রামের সময় শান্তি আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "দেখ, দিদি আমার নামে একটা পত্র লিখে গিয়েছেন; বাস্তবিক পড়্‌লে তাঁর জন্য বড় দুঃখ হয়। দিদির জীবনে কোনও সুখই নেই। রং ময়লা হলেই কি অন্তরও কাল হবে? দিদির মতন মেয়ে আর হয় না; কি ভয়ানক নিষ্ঠুর তাঁর স্বামী! আমার কিন্তু মনে হয়, দিদির প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু, প্রত্যেক উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সপত্নী ও স্বামীর কখনও মঙ্গল হয় নি; বোধ হয় কখন হবেও না। দেখ, দিদির জীবনকাহিনী পড়ে, কি রকম দুঃখময় জীবন তাঁর!"

বিমল চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আদ্যোপান্ত পড়িয়া দুইহস্তে চক্ষু চাপিয়া নীরবে সে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, "উঃ, শান্তি, এস, এস, শীঘ্র আমার কাছে এস। আমার বুকের মধ্যে কি রকম কর্‌ছে! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল!" বলিতে বলিতে বিমলের মাথা বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল। শান্তি বিমলের সহসা এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল; নিজক্রোড়ে মস্তক উঠাইয়া লইয়া জলআছড়া দিয়া পাখার বাতাস দিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইয়া বিমল বলিল, "শোন শান্তি, আমার জীবন-কাহিনী তুমিও শোন। এতদিন তোমাকে কিছুই বলি নাই; এবং তখন ভাবিতাম যে, বলিবার কিছুই নাই। হতভাগিনী কমলা আমারই প্রথমপক্ষের স্ত্রী। চমকাইও না শান্তি! সমস্ত স্থির হইয়া শোন, নিষ্ঠুর স্বামীর পাপকাহিনী শোন। বিবাহকালে আমার উচ্চআশা ছিল, আমি অর্থ লইব না, কিন্তু কন্যা দেখিতে সুন্দরী হইবে। পিতৃদেব আমার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কমলাকে বিবাহ করাইয়া প্রচুর অর্থ আনিলেন; কিন্তু সে আমার মনো-মত সুন্দরীও হইল না! আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও তাহার প্রতি কোনও অযত্ন বা কর্ত্তব্যের ত্রুটী করি নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গ যখন অসহ্য হইল, গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সতী-সাধ্বী কমলা তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে শান্তি দিয়া চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া গেল; কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, তাহার জন্য আমার বিশেষ কিছুই কষ্ট হইল না। সেই বৎসরেই কয়েকমাস পরেই তোমাকে বিবাহ করিলাম। তুমি আমার মনোমত সুন্দরী স্ত্রী হইলে। তোমাকে লইয়া আমি সোনার সংসার পাতিলাম। মাঝে মাঝে সুখে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভাবিতাম যে, কমলার যদি সহসা মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে

তোমাকে পাইতাম না, এ মধুর প্রেমের, এ অনাবিল সুখশান্তির আস্বাদও পাইতাম না। সে জন্য মনে মনে তাহার মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতাম। কিন্তু শান্তি! এ পৃথিবীতে যে নিষ্ঠুর অন্তকে সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করে, দণ্ডদাতা বিধাতা যে তাহাকেও নিক্তির ওজনে শাস্তি দিয়া থাকেন, তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের দুইজনের মধুর বিশুদ্ধ প্রেমের পরিণাম সেই দিব্য সুন্দর শিশু, আমাদের প্রাণের ধন বিনয়কুমার আজকার নিষ্ঠুরতার জন্য এ সংসার হইতে চলিয়া গেল? কমলার প্রতি আমার নিষ্ঠুরতার ফলে যে আমরা তাহাকে হারাইয়াছি, তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে, শান্তি? কিন্তু আমার জন্য তোমার এ শাস্তি কেন? বুঝি, আমার পত্নী হয়েছ বলেই তোমার উপর এ অভিশাপ। এখন বুঝেছি, কমলা কেন আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিত না; কেন সে বিজয়াকে আমার হাতে দিয়া গেল, আর কেন নিজ কন্যার শুভবিবাহে সে যোগদান করিল না? একদিন যে অভিমানিনী কমলা আমার সুখের জন্য নিজ সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, আবার সেই কমলা কিরূপে আমার বিনা আহ্বানে সেই গৃহে পদার্পণ করিবে? ধনিকন্যা সে, তাই বলিয়া সে ধনমদে গর্ব্বিতা বা বিলাসিনী নহে। সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাহার কর্ম্মকুশলতা, স্বার্থত্যাগ, নিরলসতা, সহ্যশক্তি, শ্বশুরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও যত্ন, স্বামীর প্রতি নীরব একাগ্র ভালবাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইতাম। এই সব গুণের জন্যই আমার পিতা কমলার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, 'বউমা' বলিতে অজ্ঞান হইতেন।"

বিমল চুপ করিল; উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে সে গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বলিল, "এতদিন এ-সব কথা বল নাই কেন? এ-সব জানিলে দিদিকে কি কখনও ছাড়িয়া দিতাম? দিদির স্বামী, দিদির সংসার, দিদির কন্যা, আমি কোন্ অধিকারে অধিকার করিয়া বসিয়া আছি? তাঁকে তুমি এনে দাও। তাঁর স্বামী, কন্যা, ঘর-সংসার তাঁকে দিয়ে আমি তোমাদের সেবা করে তোমাদের স্নেহের ছায়ায় সুখে ও শান্তিতে বাস করি। অভিমানিনী দিদি আমার, সেইজন্যই সপত্নীকে বাইবার পূর্ব্বে কোনও আভাস দিয়া যান্ নাই। আর না, তোমার জন্য দিদি গৃহত্যাগিনী, রাজরাণী হয়েও আজ পথের ভিক্ষারিণী, নবীন যৌবনে সন্ন্যাসিনী! আর পাপের ভার পূর্ণ করিতে দেব না! যাও তুমি, দিদির অনুসন্ধান কর, গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

অনুতপ্ত বিমল চারিদিকে খোঁজ করিল; দেশবিদেশে, যেখানে কমলার যাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতেই অর্থের মায়া না করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। শান্তি ও বিমল নিরাশ হইয়া পড়িল। বিজয়া ৭ দিন পরেই শান্তির নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন শান্তি তাহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কিছুই খুলিয়া বলিল না।

(৫)

কমলার অন্তর্হিত হইবার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন প্রাতঃকালে বিমল তাহার বাটীর বারান্দায় বসিয়া আছে, সহসা

এক অতিশয় অপূর্ব্ব বস্তু তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে দেখিল, তাহার বাটীর সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যান-পথে দীর্ঘ, উন্নত, শুভ্রবর্ণ জটাকুল-সমাচ্ছন্ন, গৌরবর্ণ, সৌম্য-স্নিগ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত এক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া উঠিলেন। বিমল তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী নিজ ব্যাঘ্রাসন পাতিয়া উপবেশন করিবার পর, বিমল অতিবিনীত ভাবে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। বিমল সেই অবসরে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল।—কি জ্যোতিঃপূর্ণ, হাস্যময় প্রশান্তমূর্ত্তি! বয়স—আশীর উপরেই হইবে। এই জ্যোতিষ্মান্ অশীতিপর সংসারত্যাগী বৃদ্ধকে দেখিলে স্বতঃই ভক্তিশ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনার নামই, বোধ হয়, শ্রীমান্ বিমলকুমার রায়। মা-লক্ষ্মী এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আমি স্বহস্তে যেন দিই, ইহাই তাঁহার শেষ অনুরোধ ছিল। পত্র পরে পড়িবেন, অগ্রে আমার বক্তব্যটা একটু শুনুন। বৎসর-দুই পূর্ব্বে কমলা-নামে এক মা-লক্ষ্মী কাশীতে আমার নিকট গিয়া আমার আশ্রয়-ভিক্ষা করেন্ ও এতদিন তিনি আমার নিকটেই কন্যারূপে ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সংসার-ত্যাগ করিয়া পুনরায় মায়াজালে জড়াইয়া পড়িলাম। তাঁহার কিন্তু কোনও পরিচয় পাই নাই!—মাআমার সাক্ষাৎ কমলাই ছিলেন। যাহা হউক ১৫ দিন পূর্ব্বে সতীলক্ষ্মী মা আমার, আমার শূন্য আশ্রম পুনরায় শূন্য করিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আবার আমার সেই শূন্য আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করি, সেই সতীলক্ষ্মী কমলার আপনি কে হ'ন?"

বিমলের এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; শূন্যদৃষ্টিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমিই সেই কমলার, সেই সতী সাধ্বীর হতভাগ্য স্বামী।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, সন্ন্যাসী নাই। কখন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পত্রখানি পড়িয়া রহিয়াছে। বিমল বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কমলা চলে গেলে, চিরদিনের জন্য অপরাধী করে রেখে গেলে? একবার ক্ষমা চাহিবার অবসরও দিলে না? যাও কমল, যে রাজ্যে শান্তি আছে, প্রেমের প্রকৃত প্রতিদান যে রাজ্যে আছে, যাও সেখানে। আমার প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতে শেষ হইলে পুনরায় মিলিত হব, তখন আমাকে ও শান্তিকে ক্ষমা করবে ত?"

পত্র খুলিয়া বিমল দেখিল কমলা স্বহস্তে মুক্তাক্ষরে লিখিয়াছে—"আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার কন্যা ও জামাতাকে দিবেন, বাকী অর্দ্ধেক দিয়া অনাথ ও দুঃখীদের সাহায্যের জন্য একটী আতুরাশ্রম খুলিবেন। চলিলাম। যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে পরলোকে পুনরায় সাক্ষাৎকার হইবে। শান্তি ও বিজয়াকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন ও আপনার চরণে শতকোটী প্রণাম।

হতভাগিনী কমলা।"

* * *

বিজয়া ও শান্তি সমস্তই শুনিল। বিজয়া মাতার আশীর্ব্বাদে স্বামিসৌভাগ্যে গর্ব্বিতা। আর শান্তি কমলার কথা উঠিলেই কাঁদিয়া আকুল।

সকলে দেশে ফিরিয়া আসিল। বিমল কার্য্য ছাড়িয়া দিল। অর্থের ভাবনা তাহার ছিল না; পিতার প্রচুর অর্থের অধিকারী সে। বিমল "কমলালয়" নাম দিয়া দেশে একটী সুবৃহৎ অনাথাশ্রম খুলিল। সে ও শান্তি দরিদ্র ও মাতাপিতৃহীন শিশুদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল।

শ্রীসুষমা সিংহ।

সোনার বাংলা দেশ।

(কোরাস্)

বন্দি মা তোর চরণ চুমি, আমার সোনার জন্মভূমি,
বিশ্বপ্রেমের শোলোক-রচা তোর ওই বেদীর তলে,
উদার আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস অমলধবল জলে ;

(পূর্ণ কোরাস্)

লুটিয়ে দে মা আমার মাথা ঘুচিয়ে সকল ক্লেশ।
নিখিল নরের ধাত্রী যে তুই সোনার বাংলা-দেশ !

(কোরাস্)

ছন্দে ছন্দে গঙ্গামাতা, বন্দে কাহার পুণ্য গাথা,
চন্দনেরি গন্ধ মাখি' মলয় বহে ধীরে,
ভৃঙ্গ কোথায় কমল-বনে মাতাল হ'য়ে ফিরে !

(পূর্ণ কোরাস্)

মেঘের তলায় দোল দিয়ে যায় কাহার কাজল কেশ !
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলা-দেশ !

(কোরাস্)

সঙ্গীতে কার পরাণ মাতায়, কানন-তরুর পাতায় পাতায়,
ঔষধি কে বইছে স্নেহে মানব-জীবন-দানে,
ভক্ত প্রাণের প্রেমের লহর ছুটলো সে কোন্‌খানে ?

(পূর্ণ কোরাস্)

শ্যামল শোভায় লুটিয়ে পড়ে মধুর মধুর বেশ !
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ !

(কোরাস্)

বিজয়-তুষার-মুকুট শিরে, ফুটছে গো রূপ ভুবন-ঘিরে,
হাজার কবির হৃদয়-চেরা ললাটে টীপ্ রাজে ;
কার সে মাটী তীর্থ ওরে মর্ত্ত্য ভুবন মাঝে।

(পূর্ণ কোরাস)

কাহার কোলের শীতল পরশ ঘুচায় সকল ক্লেশ ?
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(মহাকবি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি"র সুর)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 664. December, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৪ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। ডিসেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

পরজ—ঝাঁপতাল।

আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কূল নাই বা পাই।
আমায়—নিয়ে চল জগৎ ছেড়ে; সব কলরব শান্ত করে
শূন্য হতে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত-সীমার অন্ত নাই!
তোমায় আমায় খেলব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই;
ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয়;
মহা স্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্বছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই!
দণ্ডী খেটে দম যে ছোটে—(এবার) গণ্ডী কেটে মুক্তি চাই!
আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই;

কথা—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আহায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II র্সা র্সর্সা। ঋা ঋা র্সা। না ননা। দা দা পা I ক্ষক্ষা পা। দা দা ক্ষা |
আ মায় ভা বে র ভে লায় ভু ব ন স্রো০ তে ভা সা ও

॥
০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| গা গা। ক্ষা সা সা I সা র্সসা। গগা গা গগা। দা ক্ষা। দা না র্সর্সা I
এ বা র ভা ই এ ইভ বের বাঁ ধন চা ই নে ক খন

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা। ঋা র্সা র্সা। না না। দা ক্ষা দা II
অ কূ লে কূ ল না ই বা পা ই

২´
অন্তরা।
[র্সা র্সর্সা]
আ মায় ৩ ০ ১ ২´ ৩
II ক্ষা দা। না -া না। র্সা ঋা। র্সা না র্সা I না র্সা। না না দদা |
নি য়ে চ ০ ল জ গ ৎ ছে ড়ে স ব ক ল রব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| দা ননা। না -া না I দা দা। পা পা -ক্ষা। গা গগা। গগা গা -া I
শা শ্বত ক ০ রে শূ ন্য হ তে ০ ও ঙ্কা০ র ত রে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা ক্ষা। গগা -া -ঋা। া -ঋা। সা -া -া I না সা। গগা গা -া |
দি গ ন্তে ০ ০ দু ০ রে ০ ০ জী ব ন্ত তা ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| দা ক্ষদা। দা না র্সা I র্সা গর্গা। ঋা র্সা র্সা। না ননা। দা -ক্ষা দা I
স জী০ ব যে থা প্রা ন্ত সী মা র অ ন্ত না ০ ই

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ক্ষা দদা। না -র্সা র্সর্সা। ঋা ঋর্সা। না সা -া I না র্সা। ঋা র্সা -া |
তো মায় আ ০ মায় থে ল্ব সে থা ০ উ ড়ি য়ে প ০

০ ১ ২ ৩ ০ ১
| না দা । পা -া ক্ষা I পা ক্ষা । গা গা গা । গা গগা । দা ক্ষদা না I
রা ণ পো ০ ড়া ছা হ ভা বে র ভে লায় ভু ব ০ ন

২ ৩ ০ ১
I ননা র্সা । না র্সা গা । ঋা র্সর্সা । না -দক্ষা দা II
স্রো ০ তে ভা সা ও এ বার ভা ০০ ই

সঞ্চারী।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II র্সা র্সা । ঋা র্সা -া । না দা । দা পা -ক্ষা I ক্ষা পা । দা -া ক্ষা |
চো খে চো খে ০ মু খে মু খে ০ হ দ য়ে ০ হ

০ ১ ২ ৩ ০ ১
| গা -া । -ঋা -া সা I না সা । গা -া গা । গা গা । ক্ষা দা না I
দ ০ ০ ০ য় মা টি র ০ মা ষু ষ জা নে না

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I র্সা র্সা । গা -া গা । ঋা ঋা । না -দা -ক্ষদা I না র্সা । ঋা -া র্সর্সা |
সে প্রে মে ০ র প রি চ ০ ০য় ম হা ঋ ০ চ্ছ

০ ১ ২ ৩ ০ ১
| র্সা র্সর্সা । না র্সা -া I না র্সর্সা । না -া দা । দা ননা । না না -া I
মু কৃত তা তে ০ বি শ্ব ০ ছা ০ ড়া বি শ্বা ০ সে তে ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I ক্ষা ক্ষা । গা -া গা । গা ক্ষা । দা না সা I ননা র্সর্সা । গা ঋা র্সা |
ম হা প্রা ০ ণে প্রা ণ মি শা তে ব্যা ০ কুল ম র ম

আভোগ।

০ ১ ২ ৩ ০ ১
| না দাদা । দা -ক্ষা দা I গা গগা । র্সা দা -া । ক্ষর্ক্ষা গা । ঋা র্সা ননা I
আ কুল তা ০ ই দ য়ভী থে টে ০ দম যে ছো টে এবার

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I র্সা গগা । ঋা র্সা -া । না ননা । দা -ক্ষা দা I র্সা র্সর্সা । ঋা ঋা র্সা |
গ ণ্ডী কে টে ০ মু কৃতি চা ০ ই আ মায় ভা বে র

০ ১ ২ ৩ ০ ১
| না ননা । দা দা পা I ক্ষক্ষা পা । দা দা ক্ষা । গা গা । ক্ষা সা সা II II
ভে লায় ভু ব ন স্রো ০ তে ভা সা ও এ বা র ভা ই

আত্ম-বিসর্জ্জন।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।
মণীন্দ্র এবং জয়াবতীর প্রবেশ।)

মণি। আমার কাল টাকা না হলেই নয়। তুমি দেবে কি না, তাই বল?

জয়া। আমার কাছে টাকা নেই। রোজ রোজ আমি টাকা কোথায় পাব?

মণি। রোজ আমি টাকা চাইছি?

জয়া। রোজ নয় ত আর কি? এই এক বছর তিনি মারা গেছেন, এর মধ্যে তুই কত টাকা ওড়ালি বল দেখি? এই ক'দিনেই ত তিন হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি।

মণি। হ্যাঁ, টাকার পালক গজিয়েছে, তাই আমি তা'কে উড়িয়ে দিলুম! কালকে আমার পাঁচ শ' টাকা চাই-ই। কাল পাঁচ শ' টাকা দিও, তার পরে আর না দাও না দেবে।

জয়া। আমার কাছে আর একটী টাকাও নেই।

মণি। দেখি, তোমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা দাও দেখি! টাকা আছে কি না দেখি।

জয়া। আমার কাছে লোহার সিন্দুকের চাবি নেই।

মণীন্দ্র। কি হ'ল চাবি?

জয়া। চাবি তোর কাকা নিয়েছে।

মণি। কাকাকে দিয়েছ? তবেই সর্ব্বনাশ ক'রেছ! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও, আর কখনও চাইব না।

জয়া। তুই যখনি নিস, তখনি ত ঐ কথা বলিস্। কিন্তু তার পরে আর মনে থাকে না।

মণী। মাইরি বল্‌ছি মা, আর আমি তোমার কাছে টাকা চাইব না। যে চাইবে সে গাধা, সে ষ্টুপিড। আজ আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও; আমার বড় দরকার।

জয়া। তোর টাকার দরকার কখন নয়? লক্ষ্মী বাপ আমার! অমন ক'রে টাকাগুলো নষ্ট করিস্ নি। এর জন্যে তিনি কত দুঃখ ক'র্ত্তেন্। মর্‌বার সময় তোকে কি ব'লে গেলেন, তা কি মনে নেই? তুই আমার বড় ছেলে। আমার ভরসা তুই। তুই যদি বাবা, এমি ক'রে টাকা-কড়ি সব ওড়াবি, তবে আমি আর সব অপোগণ্ড মানুষ কোর্ব্বো কি ক'রে?

মণীন্দ্র। ঐ তোমার এক কথা! বাঁদুনি গাইতে বস্‌লে। আমি কি উড়িয়েছি? বাবার ভাঁড়ার সব ত তোমার কাছে! আমি কি আর তা' জানি না?

জয়া। থাকে, তোদেরই থাক্‌বে।

মণীন্দ্র। সে-টাকা থাকায় ফল? যখন আমার দরকার হবে, তখন যদি টাকা না পেলুম, তবে সে টাকা থেকে আমার কি লাভ? সে থাকা না-থাকা সমান।

জয়া। কিসের দরকার কাল তোর?

মণীন্দ্র। আমাদের বাগানে পার্টী আছে, নাচ্ দিতে হবে। আমি বড় লোকের ছেলে, তাই আমায় সবাই ধরে! এতে আমার মান কত!

জয়া। কায়েতের ছেলে, লেখা-পড়া

শিখেছিস্, বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে গেল? মানের মুখে আগুন!

মণীন্দ্র। গালাগাল দিও না বল্‌ছি।

জয়া। দোব না গালাগাল? একশ' বার দোব। আমাকে যেমন জ্বালাচ্ছিস্ পোড়াচ্ছিস্, এম্নি জ্বালায় নিজে জ্বল্‌বি! আমাকে যেমন কাঁদাচ্ছিস্ এম্নি তোকে কাঁদ্‌তে হবে।

মণীন্দ্র। আরে ম'ল, ভাল ক'রে বল্‌ছি না? উনি শাপ-গাল দিতে এলেন্! এতেই ত আমার সঙ্গে বনে না। পৃথিবীতে জন্মেছি, একটু আমোদ ক'র্ব না?

জয়া। আমোদের মুখে আগুন! ..... বুদ্ধি-ছাড়া আর কি কিছু আমোদ নেই? ঘরে বসে গান-বাজ্‌না কর্, অমন লক্ষ্মী বৌ রয়েছে ঘরে! তা' নয় ত! যত বদ্ ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কেবল বদ্‌খেয়ালি ক'রে বেড়াবি! একদিন রাত্তিরে বাড়ী থাক্‌বি না!

মণীন্দ্র। (অঙ্গভঙ্গি-সহকারে) আহা, হা! ম'রে যাই তোমার বোয়ের গুণের বালাই নিয়ে! চেহারাখানিত মা-কালী! হাতে খাঁড়া দিলেই হয়!

জয়া। আমি রূপের কথা বলি নি, গুণের কথা বল্‌ছি।

মণীন্দ্র। গুণ! তাও যে অষ্টরম্ভা! কি গুণ আছে তোমার বৌয়ের? তোমার বৌ গান গাইতে পারে? তোমার বৌ হার্‌মনিয়ম বাজাতে পারে?

জয়া। গেরেস্ত ঘরের বৌ-ঝি কি গান-বাজ্‌না করে যে, আমার বৌ গান বাজনা ক'র্ত্তে পার্ব্বে? নইলে আমার বৌ স্বয়ং লক্ষ্মী! তুই তাকে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা দিস্, সে একটী দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কারো কাছে বলে নি। উল্টে তোকে যদি কেউ কিছু বলে ত সে লুকিয়ে কাঁদে, আমি কত দিন দেখিছি। সে একলা আমার এত বড় সংসারটার ভার নিয়েছে! আমাকে আর কিছু দেখ্‌তে হয় না। বুদ্ধি, বিবেচনা, দয়া, মায়া ঐ কচি মেয়ের কত! তোর চোক আছে কি যে দেখ্‌বি?

মণীন্দ্র। না, আমার চোক নেই! আমি কাণা! তাই অমন কাল-পেচীকে সুন্দরী দেখ্‌তে পাই না। আচ্ছা, তুমি এখন আমাকে টাকা দাও; বেলা যাচ্ছে, আমাকে এখনি যেতে হবে।

জয়া। কোন্ চুলোয় যাবি যা। আমি তোকে আর এক পয়সাও দোব না।

মণি। না, দেবে না? তোমার বাবার টাকা!

জয়া। কি? কি বল্লি! আমি তোর মা, দশমাস দশদিন পেটে ধরিছি, বুকের রক্তে তোকে মানুষ করিছি, তুই আজ আমায় বাপ্ তুল্লি? নইলেই বা লোকে নেশাখোর বল্‌বে কেন? মদ খেলে লোকের এম্নি বুদ্ধিই হয়, বটে!

মণি। তা, আমাকে রাগাচ্ছ কেন? টাকা ফেলে দিলেই ত আমি চ'লে যাই।

জয়া। না, আজ কিছুতেই তোকে টাকা দোব না। তুই কি কর্ত্তে পারিস্ কর্।

(জয়াবতীর প্রস্থান ও অপর দিক্ হইতে লীলার প্রবেশ।)

লীলা। কা'কে যে কি বল, তার কিছুই ঠিক্ থাকে না!

মণি। কেন? কা'কে আবার কি বল্লুম!

লীলা। মায়ের কি অগ্নি ক'রে বাপ্ তোলে!

মণীন্দ্র। ওঃ!—ভাট্‌পাড়ার পণ্ডিতের কাছে বিধান নিতে ভুলে গেছলুম্!

লীলা। কোথায় যাবে?

মণীন্দ্র। যেখানেই যাই না কেন?

লীলা। তবু বল না, শুনি?

মণীন্দ্র। তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই!

লীলা। আমি কি তোমার কেউ নয়?

মণীন্দ্র। না। কে আবার তুমি?

লীলা। সত্যিই কি আমি তোমার কেউ নই? তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। আমাকে কেন তুমি বল্‌বে না?

মণীন্দ্র। কেন ব'লব না শুন্‌বে?

লীলা। বল।

মণীন্দ্র। আমি তোমাকে ভাল বাসি না।

লীলা। কেন আমাকে ভালবাস না? কি ক'লে আমায় ভাল বাস্‌বে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। তুমি কালো, তাই ভালবাসি না। সুন্দর হ'তে পার্ব্বে? আমি সুন্দরী চাই।

লীলা। সৌন্দর্য্য বিধাতার দান। বিধাতা তা আমায় দেন্ নি। সৌন্দর্য্য আমি কোথায় পাব? তা'ছাড়া আর কি কর্লে তুমি সন্তুষ্ট হবে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। গান গাইতে পার্ব্বে? হার-মণিয়ম বাজাতে পার্ব্বে?

লীলা। গান-বাজনা ত' শিখি নি। ছেলেবেলায় কেউ ত তা আমায় শেখায় নি। তুমি শেখাও। তুমি শেখালেই শিখ্‌তে পার্ব্বো। মানুষের অসাধ্য কি কাজ আছে? ছেলেবেলা থেকে যা শিখেছি, তাই জানি। গান-বাজনা কেউ ত শেখায় নি!

মণীন্দ্র। তবে আমার মাথামুণ্ডু কি পার্ব্বে? এ পার্ব্বে না, ও পার্ব্বে না, তবে কি পার্ব্বে? কেবল রান্না-ঘরে বসে তেল-কালী মাখ্‌তে পার্ব্বে? কল-তলাতে বসে কাদা ঘাঁট্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। আমরা গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, গৃহস্থ-ঘরের বৌ, গৃহস্থ-ঘরের যা কাজ তাই শিখেছি, তাই জানি। এ ছাড়া যদি কিছু শিখ্‌তে হয়, তুমি শিখিয়ে দাও।

মণীন্দ্র। আমি কেন শেখাতে যাব? আমার কি দায়?

লীলা। তুমি না শেখালে কে শেখাবে? তুমি গুরু, তুমি প্রভু! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, দেবতা, রক্ষক।

মণীন্দ্র। আর বক্তৃতা কর্ত্তে হবে না, থামো! (পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া) পাঁচটা বাজে, এখুনি তারা ডাক্‌তে আস্‌বে, আমায় যেতে হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। কে ডাক্‌তে আস্‌বে?

মণীন্দ্র। সে-কথায় তোমার দরকার কি?

(পুনঃ প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। না, না, একটু দাঁড়াও। (মণীন্দ্রের হাত ধরিল) সমস্ত দিনের ভিতর ত বাড়ী

আস না। যদি দয়া করে এসেছ, একটু দাঁড়াও।

মণীন্দ্র। (সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) আঃ! নোংরা হাত আমার গায়ে দিও না।—জামাটা নোংরা করে দিলে! (জামা দেখিতে লাগিল) জ্বালাতন কোরো না, সর; যাই।

লীলা। কোথায় যাবে? আমি যেতে দোব না। যেতে পাবে না। তুমি যাই বল না কেন, তুমি আমার! আমার ভিন্ন আর কারও নও।

মণীন্দ্র। আচ্ছা, একটা কথা বলি, শুনবে?

লীলা। কেন শুনবো না? তোমার কথা শুনতে পাই না, এই আক্ষেপ! তোমার কাজ কর্ত্তে পালে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কোর্ব্বো। তোমার আদেশ-পালন কর্ব্বার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কি কর্ত্তে হবে বল?

মণীন্দ্র। আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে পার্ব্বে?

লীলা। টাকা!! টাকা আমি কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। এই যে বাবা, এত কেঁড়েলি কচ্ছিলে! আর যেই কথাটা বল্‌ছি অম্নি পেছুচ্ছ! এটা পার্ব্বে না, ওটা পার্ব্বেনা, তবে আর পার্ব্বে কি আমার মাথামুণ্ডু? আমি জানি, মেয়ে-মানুষ কেবল কথার সর্ব্বস্ব; বিশেষতঃ তোমাদের মতন মেয়েছেলে!

লীলা। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ত নিজেদের রোজগারের ক্ষমতা নেই। স্ত্রীলোক স্বামীর টাকায় ধনবতী। আমাকে ত তুমি কোন দিন টাকা দাও নি! তবে আমি টাকা কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে আর একটা কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে?

লীলা। কি বল?

মণীন্দ্র। (চুপি চুপি) কাকার কাছ থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা চুরি করে আন্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। (শিহরিয়া) চুরি? কি সর্ব্বনাশ! চুরি আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না!

মণীন্দ্র। দূর হও আমার কাছ থেকে! (নেপথ্যে) মণিবাবু! বলি, অ মণিবাবু!—)

মণীন্দ্র। ঐ তারা এসেছে! (প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। তোমার পায়ে পড়ি, যেও না! ওদের সঙ্গে মিশো না। চেয়ে দেখ দেখি আর্শি ধরে নিজের চেহারাখানা! কি ছিলে আর কি হয়ে গেছ? আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে পড়ি, একটা দিন ঘরে থাক। একদিন আমায় তোমার সেবা কর্ত্তে দাও।

(মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল)

(নেপথ্যে) মণিবাবু! আজ বেরুবেন্ না?

মণীন্দ্র। ঐ আবার তারা ডাক্‌ছে। (স্বগত) আঃ! কোথা হতে এ পাপটা জ্বালাতন কর্ত্তে এল? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমার গলা থেকে ঐ হার-ছড়াটা দাও দেখি। তা হলে আজ থাক্‌বো এখন।

লীলা। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া মণীন্দ্রের হাতে দিয়া) এই নাও। কোন্ তুচ্ছ এ হার! তোমাকে পেলে আমি এ বিশ্বসংসারের কিছুই চাই না।

মণীন্দ্র। (হার গ্রহণ করিয়া) পথ ছাড়, আমায় যেতে হবে।

লীলা। এই বল্লে, যাবে না?

মণীন্দ্র। সে আমার খুসি!

লীলা। না, আজ কিছুতেই যেতে পাবে

না। আমি আজ কিছুতেই তোমাকে ছাড়্‌বো না। (পুনর্ব্বার মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল।)

মণীন্দ্র। (বিরক্তি-সহকারে) আঃ! একশ-বারি আলাতন ভাল লাগে না। সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল; লীলা পড়িয়া গেল। (জয়াবতীর পুনঃ প্রবেশ।)

জয়া। আহা হা! নরে যাই! হতভাগা বাছাকে ফেলে দিয়ে গেল গা? এমন লক্ষ্মী বৌ কি এখনকার দিনে হয়? কপালটা কেটে গেছে বুঝি? (গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন) বৌ-মা! ও বৌ-মা!

(ভোলানাথের প্রবেশ।)

ভোলা। বৌদিদি! তুমি আবার মণেকে টাকা দিয়েছ?

জয়া। না, ভাই, আমি ত তাকে টাকা দিই নি! আমি বলেছি লোহার সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে।

ভোলা। বেশ করেছ! ছোঁড়া আমাকে তবু একটু ভয় করে। কি করে যে ছোঁড়া শোধ্‌রাবে! (লীলাকে দেখিয়া) এ কি! বৌমা, এমন করে পড়ে কেন? কপাল দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে!

জয়া। মণে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে। হারছড়াটা বুঝি নিয়ে গেছে?

ভোলা। ওঃ! এত দূর! আমিও দেখলুম্ বটে, তার হাতে একছড়া হার রয়েছে; জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, বল্‌লে, "এ তোমাদের বাড়ীর নয়, আমার এক বন্ধুর!" মনে কর্‌লুম, হবেও বা! ওঃ! বড় ঠকিয়ে পালিয়েছে! আচ্ছা, আমিও তাকে জব্দ কোর্ব্বো। এখুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি, দাঁড়াও। যেমনকে তেমন! নইলে কিছুতেই শোধরাচ্ছে না!

[ভোলানাথের প্রস্থান।]

লীলা। (উঠিয়া) মা, কাকাকে বারণ করুন্, পুলিশে খবর দিতে বারণ করুন্। আমি হার দিয়েছি; তিনি ত নিজে নেন নি! ওমা! শীগ্‌গির যান, কাকাকে বারণ করুন্। পুলিশে নয় ত তাঁকে ধ'রে নিয়ে যাবে। ওমা, কি হবে?

জয়া। তোমার কোনো ভয় নেই মা, তোমার কাকা ভালই ক'চ্ছেন। ওকে একটু শাসন না ক'র্লে চল্‌ছে না। চল, এখন কাপড় কাচ্‌বে চল, সন্ধ্যে হয়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটী—লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির। পূজার উপকরণ হস্তে লইয়া হরিদাসের প্রবেশ; অপর দিক্ দিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

হরি। বৌ-ঠাকরুন্, এখানে এসেছেন্ এই যে! সর্ব্বেশ্বরবাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চাইছেন্।

অন্ন। কেন হরিদাস?

হরি। আমাকে সে কথা ত কিছু ব'ল্লেন না। ব'ল্লেন, আপনার কাছে বল্‌বেন্। কোন কাজের কথাই হবে।

অন্ন। কাজের কথা ত বুঝ্‌লুম্। তা কাজের কথা আমার কাছে কেন? সে ত ওঁকে বল্লেই পার্ত্তেন্।

হরি। আজকাল বাবু যে কোথায় থাকেন্, বাবুর ত দেখাই পাওয়া যায় না। হয় বাড়ীর ভেতর, নয় ত গঙ্গার ধারে ব'সে থাকেন্। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক! তাঁকে কোন কাজের কথা ব'ল্লে উত্তরই পাওয়া যায় না।

অন্ন। (স্বগত) হা—ভগবন্! যত মনে

হরি কাতর হব না, ততই মন ভেঙে পড়ে কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাঁকে আসতে বল। কি কথা আছে বল্‌তে বল।

হরি। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন; আমি ডেকে দিইগে।

[মন্দির-মধ্যে পূজার দ্রব্যাদি রাখিয়া হরিদাসের প্রস্থান ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ।]

অন্ন। আপনি আমাকে কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন্?

সর্ব্বে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মা! জমীদারী যাওয়া অবধি বাবুর মন এমন হয়েছে, তিনি ত আর কিছুই দেখেন্ না! কোথায় থাকেন্! দরকার হ'লে তাঁকে খুঁজেই পাই না। আমি এত বোঝাই, কিছুতেই তাঁর মন ফেরাতে পার্‌লুম না। তিনি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছেন। সে-দিন মণিরায়ের একটা লোক রাস্তায় এত অপমান ক'র্লে, বাবু একটী কথাও কইলেন না। মাথা নীচু ক'রে চলে এলেন। আমার এ-সব সহ্য হয় না।

অন্ন। আমি কি কোর্ব্বো? আমাকে কি কর্ত্তে বলেন্?

সর্ব্বে। মা, আপনি বুদ্ধিমতী, সাধ্বী। আপনি চেষ্টা ক'রে যাতে বাবুর মন পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পারেন, তা করুন্। আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না! আপনার গহনা বিক্রীর টাকায় বেশ ব্যবসা চল্‌ছিল, কিন্তু বাবুর অমনোযোগে সব নষ্ট হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আর থাকে না!

অন্ন। আপনি ত রয়েছেন্, আপনি কেন দেখেন্ না?

সর্ব্বে। মা, সিংহের ভার কি শৃগালে বইতে পারে? বাবুর এই রকম ভাব দেখে লোকজন কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না। মহাজনে নাল ধারে দেয় না। কি বল্‌ব মা, যেখানে আমি প্রবল প্রতাপে কাজ করে এসেছি, সেখানে আমি যেন জুজু হ'য়ে আছি! এই বেলা বাবুর মন ফেরাতে না পার্লে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হবে।

অন্ন। ঈশ্বর যা ক'র্ব্বেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নেই। নইলে এমন হবে কেন?

সর্ব্বে। অদৃষ্ট ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, মা! চেষ্টা কর্ত্তে হবে। চেষ্টায় অসাধ্য জগতে এমন কি কাজ আছে মা? বাবুর যে রকম মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে আমার ভয় করে।

অন্ন। আমি মেয়ে-মানুষ, আমার উপায় কি? আমি কি কর্ব্বো?

সর্ব্বে। আপনাকে কিছু ক'র্ত্তে হবে না, আপনি কেবল সর্ব্বদা বাবুর কাছে কাছে থাকবেন, আর তাঁকে বোঝাবেন্। তিনি চিরকাল ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্টের মুখ কখনও দেখেন্ নি! হঠাৎ একেবারে দারিদ্র্যের কোলে পড়েছেন, সেইজন্যেই মনের এত বিকৃতি ঘটেছে। তাঁকে বুঝিয়ে কাজকর্ম্মের দিকে একটু মন দেওয়াতে পার্লেই সব সেরে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি অনেক ভাল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই বল্লেন, একটু চেষ্টা কর্লেই আমাদের বিষয় আমরা ফেরত পেতে পারি। আমি এজন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। বাবু একটু মনোযোগ দিলেই, অনায়াসে আবার বিষয়টা ঘরে আসে। বড় জোর ও যে-টাকায় কিনেছে, সেই টাকাটা ওকে দিতে হবে।

অন্ন। ওঁকে এ-কথা বলেছিলেন?

সর্ব্বে। হ্যাঁ, বলেছিলুম, কিন্তু বাবু বল্‌লেন, "যা হ'বার হয়ে গেছে, আর আপনার লোককে বিপদে ফেলা কেন?"

অন্ন। তা ত সত্যি কথা।

সর্ব্বে। বলেন্ কি! যে বিশ্বাসঘাতক এমন সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে, সে আবার আপনার লোক কি? আত্মীয় ব'লে তার প্রতি আবার মায়া-মমতা কিসের? আমি এর জন্যে প্রাণপণ করেছি। নিমক-হারাম পাজী বেটাকে আমি একবার দেখে নেব। এর জন্য আমাকে নালিশ, মোকদ্দমা, যা কর্ত্তে হয়, আমি সব ক'র্ব্ব। কিছুতে ছাড়্‌ব না। এমন বদমায়েসকে শাস্তি না দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ওঃ! বেটার কথা মনে হলে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে। নেমকহারাম ব্যাটা ম্যানেজার হয়েছিলেন, রাজার হালে ছিলেন! শেষে রক্ষককেই ভক্ষণ! বাবু তাই সে-দিন চুপ করে ফিরে এলেন, আমি হলে জুতোর চোটে সেইখানেই ব্যাটার বিষয়-ভোগ করা বার করে দিতুম। আমার বোধ হয়, মণিরায়ও এর ভেতর আছে। সে-দিন যে-ভাবে কথাগুলো কইলে, তাতে স্পষ্টই একথা মনে হ'ল। তা'কেও একবার দেখে নোব।

অন্ন। কেন! মণিরায়ের সঙ্গে ত আমাদের কোনও শত্রুতা নেই! সে কেন এর ভেতর থাক্‌বে?

সর্ব্বে। শত্রুতা কি বাবুর ভগ্নীপতির সঙ্গেই ছিল, মা? হিংসুটে লোকের হিংসেয় সব করে। এ সংসারে লোকে ভালর ভাল কি দেখ্‌তে পারে? আচ্ছা, আমিও একবার সবাইকে দেখে নোব। তবে এখন আমি যাই মা! বাবুর যাতে মন পরিবর্ত্তন হয়, আপনি সে-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ক'র্ব্বেন্।

[প্রস্থানোদ্যত]

অন্ন। আর একটা কথা

সর্ব্বে। কি, আজ্ঞা করুন্।

অন্ন। বিষয়-সম্বন্ধে আপনি যা ব'ল্লেন, তা'তে ত অনেক টাকা খরচ হবে। অত টাকা এখন কোথায়?

সর্ব্বে। সেজন্য আপনি ভাব্‌বেন না; সে ভার আমার। যত টাকা দরকার হবে, আমি যেমন করে পারি, তা সংগ্রহ কর্ব্বো। তারপরে আমাদের চিরকালের পৈতৃক সম্পত্তি একবার হাতে এলে, আর ভাবনা কি? আমি এখন চল্লুম। আপনাকে যা বল্লুম, আপ্‌নি তা কর্ব্বেন্। [প্রস্থান]

অন্ন। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) হে প্রভু! বিপদ্‌ভঞ্জন! মধুসূদন! হে অকূলের কাণ্ডারি! কূল দাও নাথ! এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর, প্রভু! তুমি রাজসভায় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ করেছিলে, বালক ধ্রুবকে মোক্ষপদ দিয়েছিলে, প্রহ্লাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলে! হরি, তুমি দয়ার সাগর! তোমার করুণার সীমা নেই। আমি অবলা, তোমার মহিমা কি জানি, ঠাকুর! তুমি ভিন্ন অনাথের যে আর কেউ নেই। দয়াময়! দয়া কর। আমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ রাখ; তাঁর বুদ্ধি-জ্ঞান হরণ কোরো না, তাঁর সুমতি থেকে তাঁকে বঞ্চিত কোরো না। বিপদে পড়ে যেন তাঁর বুদ্ধিলোপ না হয়। ঐশ্বর্য্য গেছে —যাক্! ভাগ্যে থাক্‌লে আবার হবে, কিন্তু আমার স্বামীর দেহ-মনঃ-প্রাণ ভাল থাকে যেন।

[গাহিতে গাহিতে একটী ভিখারীর প্রবেশ।]

(গান)

হৃদয়-দুয়ার খুলে অনিবার
প্রাণ ভরে তাঁরে ডাক দেখি মন!
সে যে অকূল-কাণ্ডারি, ভব-ভয়হারী
তাপিতের তাপ করে নিবারণ!
এ সুখ-সম্পদ্, সকলি বিপদ্,
চিরদিন এ ত রবে না কখন!
কি ছার আশায়, ফিরিতেছ হায়,
বিষয়ের বিষে হয়ে অচেতন!
জলবিম্ব-প্রায়, মিশে সব যায়,
প্রাণে জাগে শুধু বিষাদ-বেদন।
ঘুচিবে তরাস, মিটিবে পিয়াস,
অভয়-চরণে নাও রে স্মরণ!

(ক্রমশঃ)

"আকাশ পানে চেয়ো"—

দিবস-রাতে মাঝে মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
খেলায় কাজে সকাল সাঁঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
মোহ যখন ফেল্‌বে ঘিরে,
বিপদ্ কুটিল চাইবে ফিরে,
আঁধার যখন নাম্‌বে ধীরে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
সুখের দিনে হাসির মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো।
বাদ্‌লা দিনের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
মৃত্যু যে-দিন আস্‌বে কাছে
দেখ্‌বে আঁধার আগে পাছে,
তবু নীলাকাশে বন্ধু আছে,
তাই আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী-ধামে ত্রিলোচনের মন্দির আছে। ইহার তিনটী চক্ষু আছে বলিয়াই ইনি ত্রিলোচন-নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু তখন তাঁহার পূজার জন্য এক সহস্র বিভিন্ন পুষ্প লইয়া আসিতেন। একদা বিষ্ণু সহস্র পুষ্প লইয়া আসিয়া পূজায় রত হইবেন, এমন সময় তাঁহার মন অন্য স্থানে আকৃষ্ট হইল। শিব সুযোগ বুঝিয়া একটী পুষ্প হরণ করিলেন। এ-দিকে বিষ্ণু একটী পুষ্প কম দেখিয়া বড়ই সংকটে পড়িলেন এবং সংখ্যা পূর্ণ করিবার মানসে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজায় দান করিলেন। শিবের কপালে চক্ষুটী রাখিবামাত্র উহা সংলগ্ন হইল। তদবধি তিনি

ত্রিলোচন-নামে খ্যাত হইলেন। অন্য প্রবাদ এই যে, শিব সপ্ত পাতাল পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। গৌরী শিবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। শিব তৃতীয় চক্ষু দিয়া গৌরীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই মন্দিরের তলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে। সেইজন্য সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর, এবং নির্ব্বুধেশ্বর নামে তিনটী দেবতা এখানে বাস করেন্। মন্দিরের সীমার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুইটী দেবতার মূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্তটী ত্রিলোচনের মন্দিরের কিছু দূরে অবস্থিত। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, ত্রিলোচন-দেবের পূজা করিলে নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। বৈশাখ-মাসের কোনও এক রাত্রি ও দিবা যদি কেহ জাগরণ করিয়া ত্রিলোচনের পূজা করে, তাহা হইলে সে মুক্ত হইয়া যায়। মন্দিরটী পুণার নাথুবালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চত্বরে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে যে-সকল দেব-মূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে একটীর নাম কোটী-লিঙ্গেশ্বর। চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার সন্নিকটে গণেশ ও শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে বারনারসী-নামে একটী দেবতা আছেন। ইঁহাকেই রাজা বনার দান করিয়াছিলেন। গণেশ- ও সূর্য্য-মূর্ত্তি এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিলোচন-দেবের মন্দিরটী আটটী থামের উপর অবস্থিত। ছাদটী আলেখ্য-দ্বারা ভূষিত। সম্মুখে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজা-সমাপনান্তে ভক্তগণ ঘণ্টাগুলি বাজাইয়া থাকেন্। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত ভাগে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ষণ্ড-মূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দির-সংলগ্নীভূত প্রাচীরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বামদিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে শিখগুরু নানক-সার মূর্ত্তি স্থাপিত। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গীতে নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবস্থিত।

পাপীদিগের যে কিরূপ শাস্তি, তাহার একটি চিত্রও এখানে দেখা যায়। সম্মুখে মৃত্যুরূপী নদী অবস্থিত। জীবগণ ইহা পার হইয়া অপর পারে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ বা একলা পড়িয়া নদী-তরঙ্গে বিধ্বস্ত হইতেছে; কেহ কেহ বা গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইতেছে। কোনও স্থানে পাপীদিগকে তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কাহাকেও বা লগুড়াঘাতে শাসিত করা হইতেছে। কামুক-কামুকীগণ তপ্ত লৌহে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত জ্বলনে জ্বলিতেছে।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া ত্রিলোচন-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলে, দুইটী পথের কোণে একটী সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা কানুসাহু-দ্বারা নির্ম্মিত। ত্রিলোচন-মন্দিরের সন্নিকটে অনেক দেবতার স্থান আছে। এখানে একটী দেবীর নাম উমা। কেনোপনিষদে উমার এরূপ বর্ণনা আছে যে, অসুরবিজয়ে ইন্দ্রাগ্নি-পবনাদি দেবতাগণ আত্মার স্বরূপ না জানিয়া অসুরবধে আপনাদিগের ক্ষমতা মানিয়া মহাগর্ব্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই অসদভিমানাপনয়ন-হেতু এবং আপনার স্বরূপলক্ষণ-বোধন-জন্য দেবাদির সম্মুখে

বিস্ময়নীয়রূপে ব্রহ্ম অবতীর্ণ হন্। ইন্দ্রাদি-দেবগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। অনন্তর ব্রহ্মের তিরোধান-সময়ে ইন্দ্রাদি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ অদ্ভুত পুরুষ কে? যখন অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা পরাভূত হইলেন, তখন ইনি পরমপূজ্য পুরুষ হইবেন, এই অভিধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হৈমবতী উমা-নাম্নী পরা-বিদ্যা প্রাদুর্ভূতা হন্। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "মাতঃ! উমে! এই যক্ষপুরুষ কে, যিনি দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন?" তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা উমা কহিলেন, "ইনি ব্রহ্ম। অসুর-সংগ্রামে তোমরা ঈশ্বর-কর্তৃক জয়লাভ করিয়াছ। ঈশ্বরেরই এই বিজয়। তোমরা নিমিত্তমাত্র। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা যে বল, 'আমরা জয় করিয়াছি', সে শুদ্ধ অভিমানের কার্য্য। অতএব মিথ্যাভিমান ত্যাগ কর।" এই উমা-বাক্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। উমাই প্রণবরূপা! উ ম অ এই অক্ষরত্রয়-সম্বলিত হইয়া উমা হইয়াছে।

ত্রিলোচনঘাট পিলপিল-তীর্থ নামে খ্যাত। এখানে গঙ্গা-স্নান করিয়া তীর্থকামিগণ পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে গমন করে ও তথায় যাইয়া পুনরায় স্নান করে; পরে মণিকর্ণিকা-কূপে যাইয়া কূপোদকে অবগাহন করে। পিলপিল-ঘাটের অনতিদূরে গাই-ঘাট অবস্থিত।

সন্নিকটে যে দুইটী মন্দির দেখা যায়, তন্মধ্যে একটী নির্ঋতেশ্বরের ও অন্যটী আদি মহাদেবের। দুইটী মন্দিরই কারুকার্য্য-হীন। আদি-মহাদেবের মন্দিরে ব্যাস-গদি আছে। ব্রাহ্মণ এই গদিতে উপবিষ্ট হইয়া কথকতা করেন। দ্বারের সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে এবং তথায় যে চত্বর দেখা যায় তদুপরি পার্ব্বতীশ্বরীর প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজমানা। এখানে আরও অনেক দেবতা আছেন। উক্ত অশ্বত্থবৃক্ষের পশ্চাতে গণেশের মন্দির অবস্থিত।

* * *

গঙ্গাতটে যে-সকল তীর্থস্থান অবস্থিত, তন্মধ্যে পঞ্চগঙ্গাঘাট একটি। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, এখানে পাঁচটী নদী সম্মিলিত হইয়াছে; যথা ধূতপাপা, জ্বরনানন্দ, কিরণ-নদী, স্বরস্বতী এবং গঙ্গা। প্রবাদ এইরূপ যে, ধৌতপাপা-নাম্নী একটী কুমারী ধর্ম্মনামক স্বীয় স্বামীকে উপহাসচ্ছলে শাপ দিয়া ধর্ম্মনদ-নামক নদীতে পরিণত করেন। স্বামীও প্রতিহিংসা লইবার মানসে তাহাকে পর্ব্বতে পরিণত করেন। কুমারীর পিতা বেদাহ্বয় দয়াপরবশ হইয়া কন্যাকে চন্দ্রকান্ত-প্রস্তরে পরিণত করেন্। তৃতীয় স্রোতস্বতী কিরণ-নদী সূর্য্যের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সূর্য্যদেব যখন মঙ্গল-গৌরীর আরাধনায় রত থাকেন্, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সেই ঘর্ম্মই কিরণ-নদীর জনক। এখানকার সংলগ্নীভূত ঘাটে মঙ্গলগৌরীর মূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী ও গঙ্গা এবং সরস্বতী একত্রে পঞ্চনদরূপে বিখ্যাত। কেবলমাত্র গঙ্গাই চক্ষের গোচরীভূত ও অন্যগুলি দৃষ্টির বহির্ভূত।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া লক্ষণবালা-ঘাটে যাইতে পারা যায়। এখানে লক্ষণবালা-নামে একটি মন্দির আছে। দেওয়ালগুলি ছবি-দ্বারা পরিশোভিত। ছবির মধ্যে বৃক্ষের

ছবিই অধিক। অন্যান্য ছবি নাই, এ-কথা বলিতে পারা যায় না। এই ছবিগুলির মধ্যে দশ-মহাবিদ্যারও ছবি আছে। হিন্দুরা ব্রহ্মকে যেমন পুরুষ মানেন, তেমনই স্ত্রীও মানেন। তিনি বালকও বটেন্ এবং যুবাও বটেন। তাই শ্রুতিতে আছে—পুমাং স্ত্বং স্ত্রী ত্বং উতস্ত্বং বালো যুবা বৃদ্ধস্ত্বং দণ্ডো দণ্ডেন জীর্যতি। এই দশমহাবিদ্যা বিষ্ণুর দশাবতারের রূপান্তর-মাত্র। যথা :—

কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরী জামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠো বগলাদেবী মীনো ধূমাবতী তথা।
বুদ্ধোমতঙ্গী বিজ্ঞেয়া কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশ বিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালিকা। এই কৃষ্ণ-নামোল্লেখে রামমূর্ত্তি। বরাহরূপ তারা, ষোড়শী পরশুরাম। ভুবনেশ্বরী বামনরূপ। বলরাম-মূর্ত্তি ভৈরবী। ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, কূর্ম্মরূপ বগলা, ধূমাবতী মীন, বুদ্ধরূপ মাতঙ্গী, এবং কল্কিরূপ কমলাত্মিকা। এই দশাবতার দশ মহাবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণবালা-মন্দিরে, তীর্থকামিগণ মালা জপ করেন। এখানে গান-বাজনাও হইয়া থাকে। যেখানে বাদকগণ উপবেশন করে, তাহার কোণে তিনটী মূর্ত্তি আছে। মধ্যে যে মূর্ত্তি অবস্থিত, তাঁহার পরিধানে নীল বসন, মস্তকে নীল পাগড়ী ও গলায় ফুলহার। ইহার বামদিকে একটি গিল্‌টি করা চক্র দেওয়ালে গাঁথা আছে। তাহাতে নাক, চক্ষু, গাল, মুখ এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহাই সূর্য্য-দেবের মূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণ দিকে চন্দ্রের মূর্ত্তি। ইহাদিগের সামান্য দূরে একটি দীপ জ্বলিতে থাকে।

পঞ্চগঙ্গাঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া ঔরঙ্গজেব-নির্ম্মিত মস্‌জিদে যাওয়া যায়। ইহাই 'মধুদাসকা দেওড়া' নামে খ্যাত। মস্‌জিদটী খুবই পাকা।—দেখিলেই বোধ হয় যেন নূতন তৈয়ার হইয়াছে। কত শতাব্দী এই মস্‌জিদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা নবীনত্ব হারায় নাই। মস্‌জিদটীতে কেবলমাত্র শুক্রবারে লোকজন সমবেত হইয়া নমাজ পড়ে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহারই আয়ে মস্‌জিদের খরচার সরবরাহ চলিয়া থাকে। একজন মুল্লা এই মস্‌জিদের মালিক।

বারাণসী-ধামের উত্তর দিকে কামেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাই পুরাতন মন্দির। ইহা খুব যে পুরাতন, তাহা নহে; তবে আধুনিকও নহে। এখানে অনেক দেবতাই আছেন। চতুরস্রের মন্দিরগুলি লাল রঙ্গে রঞ্জিত। এখানকার প্রধান মন্দিরটি কামনাথ বা কামেশ্বরের। ইনিই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অন্য মন্দিরে রাম সীতা, লক্ষ্মী এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। এখানে ১০।১২টি মন্দির অবস্থিত।

ইহার উত্তর দিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে অনেকগুলি দেবতা আছেন। তন্মধ্যে একটি নরসিংহ-মূর্ত্তি। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য একটি স্তম্ভ হইতে ইনি নরসিংহাকারে আবির্ভূত হন্। ইহার ক্রোড়ে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। এখানে মৎস্যোদরীর মূর্ত্তিও দেখা যায়। ইনি ময়ূরাসনা। এখানে দুর্ব্বাসা ঋষিরও মূর্ত্তি অবস্থিত।

কামনানাথের মন্দির-সংলগ্ন একটী ঝিল (পুষ্করিণী) ছিল। তাহা মৎস্যোদরী-তীর্থ-নামে আখ্যাত হইত। পুষ্করিণীটী এখন বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং, কামনানাথের মন্দিরে তীর্থকামীদিগের ভীড়ও কমিয়া গিয়াছে।

অওসানাগঞ্জ মহল্লার ঈশ্বরনাদী শড়কে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনি শিবলিঙ্গ। মন্দিরটীতে বারাণসীর মহারাজ হইতে দীন-হীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই আসিয়া থাকেন। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটী ষাঁড় উপবিষ্ট দেখা যায়। ষাঁড়টী নন্দী-নামে খ্যাত। বিগ্রহটী কৃষ্ণপ্রস্তরের। উচ্চতায় ইহা ৬ ফিট এবং ব্যাসে ১২ ফিট। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে শিব প্রস্তরাকারে আবির্ভূত হন। ইহার উপরে একটি সরা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ইহাকে ঝাড়া দেওয়া হয়।

অওসাতগঞ্জ-মহল্লার লাগাও কাশীপুর মহল্লা অবস্থিত। এখানে দুইটী ঘরবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। একটী ঘরের কুলুঙ্গিতে কাশীদেবী অবস্থিত। তীর্থকামিগণ অন্যান্য মন্দির দেখিয়া এখানে একবার আসিবেই আসিবে। এখান হইতে কিছু দূরেই ঘণ্টাকর্ণ-তালাও নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঘণ্টাকর্ণ নামে এক পিশাচ ছিল, তাহারই নামে এই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছে।

কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে একটী চতুরস্রে যাওয়া যায়। জলে অবতরণ করিতে হইলে সিঁড়িই সম্বল। চতুরস্রের দক্ষিণদিকে তিনটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে মধ্যস্থিত মন্দিরটী ব্যাসদেবের। ইহা ব্যাসেশ্বর-নামে খ্যাত। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে বেদব্যাস উপবিষ্ট আছেন। ইহার গলে ফুলহার। রামনগরে বেনারসের মহারাজও ইহার নামে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শিবের সহিত সম্বন্ধীভূত বলিয়া ব্যাসের পূজা শিব-পূজাতেই সম্পন্ন হয়। কর্ণঘণ্টা-তালাওয়ে সেটী হয় না। এখানে ব্যাসের স্বীয় মূর্ত্তি আছে। শ্রাবণ-মাসে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ রমণাগণ, এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া অশ্বত্থ, কদম্ব ও বটবৃক্ষের পূজা করেন্।

আমরা এখানে বেদব্যাস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যাঁহার অসামান্য প্রতিভা-বলে হিন্দুজাতি অদ্য জগৎপূজ্য আসন গ্রহণ করিয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ত্রুটি রহিয়া যাইবে। বেদব্যাসের আখ্যায়িকা এইরূপ :—দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মে। চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে যক্ষ-হস্তে হত হন। বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত-রমণাসক্তি-প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালেই মৃত হইয়াছিলেন। উক্ত দাসকন্যা সত্যবতীর অনূঢ়া-কালে মহামুনি পরাশর-কর্ত্তৃক দ্বৈপায়নের উৎপত্তি হয়। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ ও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। লোকে ইঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার মনে করিতেন্। বদরিকাশ্রমে বাস করাতে ইহার অপর এক নাম বাদরায়ণ। ইনি বেদকে চারি খণ্ডে বিভাগ করাতে "বেদব্যাস"-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ হইতে বর্গ-বিভাগক্রমে মন্ত্ররাশি উদ্ধৃত করিয়া ইনি চারি সংহিতা করেন্। পরে বেদব্যাস আপনার চারি

শিষ্যকে আত্মসমীপে আহ্বান করিয়া সেই সকল বেদ-সংহিতার এক এক সংহিতা এক এক শিষ্যকে প্রদান করেন্। তিনি স্বশিষ্য পৈল-ঋষিকে ঋগ্‌বেদ-সংহিতা বলেন; আর বৈশম্পায়ন-নামক শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ বলেন; জৈমিনিকে সামবেদ ও ছন্দোগ-সংহিতা বলেন এবং আঙ্গিরসীশ্রুতি-সমন্বিত অথর্ব্ববেদ সুমন্ত-নামক শিষ্যকে বলেন।

ব্যাস-শিষ্য পৈলাদি ঋষিগণের দ্বারা ঐ বেদ-চতুষ্টয় চারিভাগে পুনর্বিভক্ত হয়। যথা মন্ত্র, যজ্ঞ, উদ্গাত্র ও স্তোম। মন্ত্রময় ঋগ্বেদ, যজ্ঞময় যজুর্ব্বেদ, উদ্গাত্র সাম এবং স্তোম অথর্ব্ববেদ। এই চারিভাগের প্রণেতা পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত। ইহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্য-দ্বারা অনন্ত শাখায় বেদ বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম, ঋগ্বেদ-শাখা—ইন্দ্রপ্রমতি, বাস্কল, আশ্বলায়ন, অগ্নিমিত্র, মাণ্ডুকেয়, মণ্ডু, মাণ্ডব্য, সৌভরি, সাকল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল, ও শিশির। অপর, জাতুকর্ণ। ঐ জাতুকর্ণ সমগ্র বেদের প্রথম নিরুক্তকার হন। পরে তাঁহার শিষ্য যাস্ক, শাকপুণি, উর্ণনাভ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যকার হইয়াছিলেন। বলাক, পৈল, জাবাল, বিরজ, বাস্কলি, বালিখিল্য কাণ্বি, মণ্ডল ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় প্রভৃতি তিনশত পঞ্চশৎ শাখায় ঋগ্‌বেদ বিভক্ত হয়।

যজুর্ব্বেদের প্রণেতা বৈশম্পায়ন। ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য-দ্বারা যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যথা শুক্ল-যজুঃ ও কৃষ্ণ-যজুঃ। ইহার শাখা—তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়, কঠ, কাঠক, হিরণ্যকেশীয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, শ্বেতাশ্বতর, কালাগ্নিরুদ্র, গায়ত্রী প্রভৃতি একশত পঞ্চদশ।

সামবেদ-প্রণেতা জৈমিনি, তাঁহার পুত্র কৌথুম ও ইন্দ্রপ্রমিতি। ইহাদিগের প্রণীত এই দুই শাখা। এগুলিও শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা অনেক শাখায় বিভক্ত হয়। হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, পৌষ্পঞ্জি—এই তিন শাখা আবন্ত্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করে। ঐ পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্য ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যাহশিষ্যের চতুর্ব্বিংশতি শাখা। তন্মধ্যে হিরণ্যনাভাদিও কেনেষিতাদি শত শত লোক, অর্থাৎ লোলাক্ষি, লাঙ্গল, কুল্য, কুলিশ, কুক্ষি, শাখা বিভক্ত করেন।

অথর্ব্ববেদ-প্রণেতা সুমন্ত তৎকৃত অথর্ব্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; যথা শান্তিকল্প, ও নক্ষত্রকল্প। শান্তিকল্পে ষট্‌কর্ম্মলক্ষণ, নক্ষত্রকল্পে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিচার। তাহাতে ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপদেশ আছে। রাজনীতিক, বৈষয়িক কর্ম্মের উপদেশ, পদার্থতত্ত্ব, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি অনেকানেক সাংসারিক বিষয়ে উপদেশও আছে। তদ্ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়েরও অনেক প্রকার উপদেশের জন্য তৎশিষ্যাদ্যশিষ্যেরা শাখা। ভেদ করেন; যথা প্রশ্ন, নারায়ণ, মহ, বানশাত্য কৌশিতকী, শতপথ, গোপথ, অথর্ব্বশিখ, অথর্ব্বশিখরা, গর্ভ ক্ষুরিক, আত্মবোধ, কৈবল্যাদি এবং শৌণ্ডায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ পিপ্পলায়ন, বেদদর্শক, কুমুদ, শুনক, জাজলি, বজ্র, আঙ্গিরস, সৈন্ধবায়ন, সাবর্ণি প্রভৃতি কৃত বেদশাখা পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত হয়। কেবল কশ্যপমুনি নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরাসাদিরা শান্তিকল্পীয় বেদাচার্য্য হন।

অপর এই চারিবেদের মুখ্য শাখাকে উপবেদ বলিয়া ধৃত করিলেন যথা ঋগ্বেদের

অন্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের অন্তর হইতে ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের অন্তর হইতে গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর হইতে জ্যোতির্ব্বেদ ও শিল্পোপদেশ বাহির হইয়াছে।

বেদাঙ্গ-শাস্ত্রও বেদ হইতে নির্গত হয়। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ বেদের ছয়টী অঙ্গ। বেদান্ত-শাস্ত্রও বেদাঙ্গত্বে ধৃত ; যথা উপনিষৎ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ-সমষ্টি ও ব্রহ্ম-প্রশংসা।

অপর ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত পুরাণ, কাব্য ও ইতিহাস। এই সকল বৈদিক প্রস্তাবকে পঞ্চম বেদ বলে। অল্পবুদ্ধি জনের বেদার্থ-বোধের নিমিত্ত ভগবান্ বাদরায়ণ বিভাগানুক্রমে শ্লোক করিয়া ইতিহাস-পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার গ্রাহক ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত ইত্যাদি। এই কয়েক জনের মধ্যে কাব্য-গ্রাহক বাল্মীকি, ইতিহাস-গ্রাহক বৈশম্পায়ন।

পুরাতন-কথাপ্রসঙ্গকে পুরাণ কহে। পুরাণের লক্ষণ ষট্‌সংবাদ। ইতিহাস কাব্যের এক সংবাদমাত্র। পঞ্চলক্ষণ ও দশ-লক্ষণাক্রান্ত মহাবল্লাখ্যায় পুরাণ দ্বিবিধ অর্থাৎ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বাদিরাজবংশ ও বংশানুচরিত-উপপুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ।

মহাপুরাণের লক্ষণ :—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, সংস্থা, পোষণ, ঊতিভ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, মুক্তি ও আশ্রয় ইত্যাদি। সৃষ্টির লক্ষণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :— অব্যাকৃত পরমাত্মা হইতে প্রথমতঃ মহতত্ত্ব ও অহংতত্ত্বাদি সূক্ষ্মরূপ মহাভূতাদির বৃত্তির, সূক্ষ্মেন্দ্রিয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম সৃষ্টি (১)। তাহা হইতে স্থূল-ভূতাদির যে উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিসর্গ বলে। যেমন আদিবীজ হইতে পুনঃ বীজোৎপত্তি হয়, তদ্বৎ ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্ব্বকর্ম্ম বাসনার প্রধানরূপ সমাহার অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যরূপ চরাচর প্রাণিমাত্রের উৎপত্তিকে প্রতিসৃষ্টি বলে (২)। অপর উৎপন্ন জীবের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা-নির্দ্দেশ-করণকে বৃত্তি বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন। (৩)। দেব, তির্য্যক ও নরাদিরূপে অবতার হইয়া ভগবান্ এই বিশ্বের শান্তিবিধান করেন, সেই শান্তিবিধানের নাম রক্ষা (৪)। স্বায়ম্ভুবাদি অতীত ষট্‌মন্বন্তর ও বর্ত্তমান বৈবস্বৎ এবং অনাগত সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ কাল বর্ণনার নাম মন্বন্তর (৫)। অনন্তর তদ্ভব মন্বাদির ক্রমান্বয়ে বংশ-বিস্তার-কথনকে বংশ বলে (৬)। এতদর্থে ঈশ্বরানুচরিত-বর্ণন করার নাম বংশানুচরিত (৭)। এই বিশ্বের চতুর্ব্বিপ্রলয়কে অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও মহাপ্রলয়াদি চারি প্রকার প্রলয়কে নিরোধ বলে (৮)। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্যাদি চতুষ্টয়াদিকে মুক্তি বলে (৯)। নিরতিশয় পরমাত্মাতে সমাশ্রিত হইয়া সর্ব্বসংসার-বন্ধের পরিমোচন এবং ব্রহ্মভূত জীবের পরব্রহ্মে লয়াবস্থার নাম আশ্রয়।

অনন্তর মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংজ্ঞা-ভেদে নাম হইয়াছে। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

উপপুরাণের সংজ্ঞা যথা—আদি, বৃহদ্ধর্ম্ম,

ধর্ম্ম, কালিকা, নৃসিংহ, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কল্কি, দেবী, মহাভাগবত, আশ্চর্য্য, বৃহৎকূর্ম্ম, বৃহন্নসিংহ, বিষ্ণু, পরাশর, বৃহৎশিব, বৃহল্লিঙ্গ ইত্যাদি অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইতিহাস মহাভারত। কাব্য বাল্মীকির রামায়ণ। ইহার গ্রাহক ভরদ্বাজ ঋষি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদব্যাস ছিলেন বলিয়া ও তাঁহার শিষ্যকৃত পুস্তকাদি আছে বলিয়াই ভারত আজি সভ্য-সমাজে গণ্য; নতুবা আজ ভারতবাসীর গণনা অসভ্য দিগের সহিত হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

ঝরণাটি ওই ক্ষুদ্র বলে মিশ্‌তে ছুটে অতল জলে,
গন্ধবিহীন ফুলটী যেও ফুটতে যে চায় গোলাপ দলে!
ক্ষুদ্র কুমুদ যশের তরে ধায় গো চাঁদের কিরণ আশে,
বল্লরীও বৃহৎ হ'তে বৃক্ষে জড়ায় বাহুর পাশে!
ক্ষুদ্র ছুটে মহৎ হ'তে, মহৎ আরও উচ্চে ধায়,
উচ্চ হ'তে উচ্চে শেষে মিশ্‌তে তাঁরই চরণ-ছায়!
সব যে হেথা আপনহারা, যশের আশে অন্ধ যে,
ক্ষুদ্র হ'তে চায় না যে কেউ, সবাই সমান স্বাধীন যে!
মহৎ হ'তে মহৎ যে জন, দীনের হ'তে দীন যে সেই,
ক্ষুদ্র সবাই বৃহৎ হ'লে, গরব যে তা'র কোথাও নেই!

"কেন"—

জীবন আমার শূন্য এমন
মরুর মতন কেন?
—তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
ফুল ফোটে না, ফল ধরে না,
গলায় নাকো শাখা,—
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
কেন পরাণ-পাখী আমার গাহে না গো গান?
নিঃশ্বসিয়া সদাই যেন তোলে বিলাপ-তান!
ধরণীর এই ছন্দে কেন বাজে না মোর প্রাণ!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
হৃদয়-আকাশ সদাই যেন বিষাদ-মেঘে ঢাকা,
পৌর্ণমাসী রাতে তবু ফোটে না চাঁদ রাকা!
কেন সকল গীতি আমার নয়নজলে মাখা!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
তোমায় যে-দিন পাব বুকের মাঝারে
হাহাকার মোর মিলবে গীতি-ঝঙ্কারে
কাঁপবে আমার দেহ-বীণা, সুর পাবে না তারে,
ভেসে সব প্রেমের অকূল পাথারে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।